## তিন গোয়েন্দা

রকিব হাসান

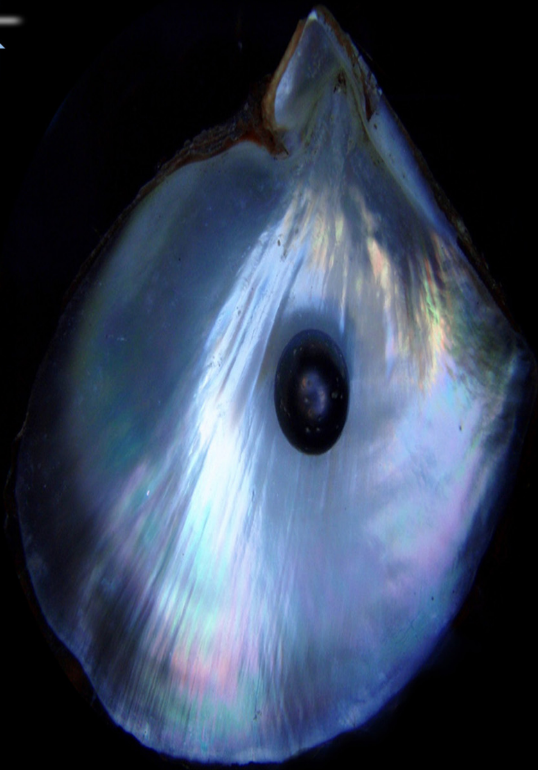

# মুক্তোশিকারী

প্রজাপতি প্রকাশন

অহর

এই বইটি বাংলাপিডিএফবই এর সৌজন্যে নির্মিত। বইটি ভালো লেগে থাকলে অবশ্যই এর একটি কপি আপনার নিকটতম বুকস্টল থেকে সংগ্রহ করার জন্য অনুরোধ করা হল। লেখক কিংবা প্রকাশকের কোন প্রকার আর্থিক ক্ষতি আমাদের কাম্য নয়।

বাংলাপিডিএফবই ওয়াটারমার্ক বিহীন বই প্রকাশ করে থাকে। এই পদ্ধতি অবলম্বনের কারনে আমাদের ওয়েবসাইটটির প্রসারে ও প্রচারে বাধা আসছে। কাজেই সবার কাছে অনুরোধ করা হচ্ছে যে আপনি এই ওয়েবসাইটটি থেকে বই ডাউনলোড করে উপকৃত হলে, অবশ্যই আপনার পরিচিতজনদের কাছে আমাদের সাইটটি শেয়ার করবেন।

বাংলাপিডিএফবই কর্তৃপক্ষ

BANGLAPDFBOI.COM

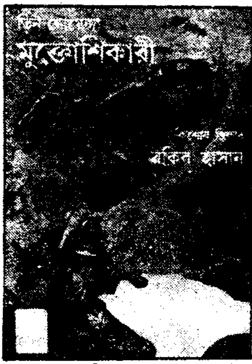


# মুক্তোশিকারী

**প্রথম প্রকাশ ঃ ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৮**

'কোথাও ঢুকে একটা হ্যামবারগার খেয়ে নিলে কেমন হয়?' প্রস্তাব দিল মুসা আমান।

গ্রীষ্মের ছুটি শুরু হয়েছে। ওদের প্রিয় সৈকতে সাঁতার কাটতে গিয়েছিল তিন গোয়েন্দা—কিশোর পাশা, মুসা আমান আর রবিন মিলফোর্ড। প্রায় সারাটা দিনই কাটিয়েছে সৈকতে। সাগর পাড়ের রাস্তা ধরে সাইকেলে করে রকি বীচে বাড়ি ফিরছে এখন। দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার উপকূলবর্তী ছোট্ট একটা শহর রকি বীচ, সান্তা মনিকা থেকে কয়েক মাইল দূরে।

গোয়েন্দা সহকারীর প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেল রবিন, সাইকেলের গতি বাড়িয়ে পাশাপাশি হলো মুসার।

যে কোন ব্যাপারে ঠাণ্ডা মাথায় ভালমত খতিয়ে দেখা স্বভাব প্রধান গোয়েন্দা কিশোর পাশার। সাইকেল চালিয়ে গরম হয়ে উঠেছে শরীর, সারা দিন সাঁতার কেটে ক্লান্ত। ভেবে দেখল, মুসার কথাটা মন্দ না। তারও খিদে পেয়েছে। সামনেই পথের পাশের পাহাড় চূড়ায় পুরানো 'স্ন্যাকস' রেস্টুরেন্টটায় থেমে কিছু খেয়ে নিলে ভালই হয়, পেটও ঠাণ্ডা হবে, বিশ্রামও হবে।

কিন্তু হ্যাঁ বলল না কিশোর, আরও খতিয়ে ভাবল। এখন বাজে বিকেল তিনটে, নাস্তা করেছে সেই সকাল ছ-টায়। কিছু মুখে না দিয়ে বাড়ি ফিরলে—মেরিচাচী যদি শোনেন—এত বেলা পর্যন্ত কিছু খায়নি ওরা, বকা যে কি পরিমাণ দেবেন…নাহ্, খেয়ে নেয়াই ভাল।

'ঠিক আছে,' চেঁচিয়ে সামনের দুই সঙ্গীকে বলল কিশোর, 'সামনে থাম। ওশনসাইড রেস্তোরাঁয় খাব।'

এ-সময়ে ভিড় থাকে না, এক-দেড় ঘণ্টা আগেই দুপুরের খাওয়া খেয়ে চলে গেছে লোকে। রেস্তোরাঁ প্রায় খালি। রাস্তার দিকে একটা জানালার পাশে বসল তিন গোয়েন্দা। পা লম্বা করে দিয়ে চেয়ারেই আধশোয়া হয়ে পড়ল মুসা। মেনু দেখায় মন দিল রবিন।

ঘরে যে কজন খদ্দের আছে তাদেরকে দেখছে কিশোর। লোকের চেহারা দেখে তাদের স্বভাব অনুমান করা তার হবি। তাছাড়া সব জিনিসই খুব খুঁটিয়ে দেখে সে, কোথাও এতটুকু ফাঁক রাখতে চায় না।

একটা লোক বিশেষভাবে কিশোরের দৃষ্টি আকর্ষণ করল। হালকা-পাতলা, ওদেশের মানুষের তুলনায় বেঁটেই বলা চলে, পাঁচ ফুট পাঁচের বেশি না। গাঢ় বাদামী স্যুট পরনে, সাদা শার্ট—গলার কাছে দুটো বোতাম খোলা, চোখা কালো জুতো, অবিশ্বাস্য রকমের বড় পায়ের পাতা। বুক পকেটে ভাঁজ করে রাখা একটা

কাগজ, তার কয়েকটা শব্দ বেরিয়ে আছে, পড়া যায়, তা থেকেই বুঝল কিশোর, লোকটার ঘোড়দৌড়ের নেশা আছে, জুয়াড়ী।

কাউন্টারের সামনে এক কাপ কফি নিয়ে টুলে বসেছে লোকটা, খালি নড়ছে, উসখুস করছে, খানিক পর পরই মাথা বাড়িয়ে জানালা দিয়ে উঁকি মারছে রাস্তার দিকে। বেশ বড়সড় টুলে বসেছে, পাশে রেখেছে চার কোণা একটা বাক্স, একটু পর পরই ছুঁয়ে দেখছে বাক্সটা জায়গামত আছে কিনা। যেন কেউ নিয়ে যাবে ওটা। একটা জালি কাপড় দিয়ে মোড়া বাক্স, কাপড়ের জোড়াগুলো নিপুণভাবে টেপ দিয়ে আটকানো।

আরেকবার জানালার বাইরে লোকটা উঁকি দিতেই কিশোরও মাথা খানিকটা সরিয়ে চট করে দেখে নিল রাস্তার কি দেখা যাচ্ছে। একই সঙ্গে চোখের কোণ দিয়ে লোকটার ওপরও নজর রেখেছে।

কই, তেমন কিছু তো না। প্রায় নিঃশব্দে চলে গেল কয়েকটা লিমোসিন। ওগুলোকে গুরুত্ব দিল না লোকটা। তারপর শোনা গেল মোটরের জোরাল গোঁ গোঁ, আরেকটা গাড়ি আসছে। টুল থেকে লাফিয়ে উঠে জানালা দিয়ে বাইরে চেয়ে রইল লোকটা, সতর্ক দৃষ্টি, কারও আসার অপেক্ষা করছে বুঝি। একটা ক্যাম্পার গাড়ি দেখা গেল। আবার এসে টুলে বসে পড়ল সে।

ভারি কোন গাড়ি—ভ্যান বা ট্রাক জাতীয় কিছুর অপেক্ষায় রয়েছে লোকটা—ভাবল কিশোর।

হ্যামবারগার নিয়ে এল ওয়েইট্রেস। নিজের প্লেট টেনে নিল কিশোর। বন রুটির ওপরের অংশ ছিঁড়ে আলাদা করে রেখে মাংসসহ বাকিটুকু তুলে নিয়ে কামড় বসাল।

অবাক কাণ্ড! চোখ টিপল লোকটা। হেসে তার জবাব দিল কিশোর।

ব্যাপারটাকে আমন্ত্রণ ধরে নিল লোকটা। চারকোণা বাক্সটা হাতে নিয়ে এগিয়ে এল তিন গোয়েন্দার দিকে।

'সাঁতার কাটতে গিয়েছিলে?' সাধারণ একটা প্রশ্ন, লোকটার বলার ধরনে বিশেষ অর্থবহ হয়ে উঠল। চোখও টিপল সেই সঙ্গে।

'হ্যাঁ,' হ্যামবারগারে মুখ বোঝাই মুসার, হাসতে পারছে না ঠিকমত। 'উইলস বীচে।'

'উইলস বীচ?' মুসার কথার প্রতিধ্বনি করল যেন লোকটা। 'এজন্যেই এত খিদে পেয়েছে।' চোখ টিপল।

এমনি একটা কথার কথা বলল লোকটা, তাতে হাসির কিছু নেই, কিন্তু হেসে ফেলল তিন গোয়েন্দা। কথার সঙ্গে চোখ টেপাটা বেশ মজার মনে হয়েছে ওদের কাছে।

লোকটাও হাসল।

'বসি তোমাদের কাছে?' চোখ টিপল লোকটা।

জানালার কাছে চেয়ার সরিয়ে নিল কিশোর, তার পাশের খালি চেয়ারে বসল লোকটা। বাক্সটা নামিয়ে রাখল মেঝেতে।

'আমার নাম স্লেটার, অসকার স্লেটার,' বলতে বলতেই ডান চোখ টিপল বেশ জোর দিয়ে।

নিজেদের নাম বলল তিন গোয়েন্দা।

'পরিচিত হয়ে খুশি হলাম,' স্বাভাবিক কথা, কিন্তু লোকটার চোখ টেপা অস্বাভাবিক করে তুলল কথাটা। ভারি এঞ্জিনের শব্দ শোনা যেতেই লাফিয়ে উঠে জানালা দিয়ে উঁকি দিল। একটা তেলের ট্রাক চলে গেল। আবার বসে পড়ল সে।

'আমার নাম স্লেটার বটে,' বলল সে, 'কিন্তু চোখ টিপি বলে সবাই ডাকে ব্লিংকি।' বলতে বলতেই আরেকবার চোখ টিপল।

এবার আর হাসি এল না ছেলেদের, খারাপ লাগছে লোকটার জন্যে। চোখ সে ইচ্ছে করে টেপে না, এটা তার মুদ্রাদোষ। চেষ্টা করেও ঠেকাতে পারে না।

এক সঙ্গে বসে চা খেলো ওরা। একটা দশ ডলারের বিল ওয়েইট্রেসের হাতে ধরিয়ে দিয়ে স্লেটার বলল, 'হ্যামবারগারের দামও রাখুন,' চোখ টিপল। 'না না, মানা কোরো না। আমি তোমাদের খাওয়ালাম। বন্ধু ভাবতে আপত্তি আছে?' চোখ টিপল।

কোমরে হাত রেখে দাঁড়িয়েছে ওয়েইট্রেস, স্লেটারের চোখ টেপার কি অর্থ করেছে কে জানে, রাগ দেখা গেল তার চোখে। কিছু বলতে গিয়েও বলল না। নোটটা নিয়ে গটমট করে হেঁটে চলে গেল। বিল রেখে ভাঙতি নিয়ে ফিরে এল।

মেহমানদারীর জন্যে স্লেটারকে ধন্যবাদ জানাল ছেলেরা।

পরের কয়েক মিনিটেও ভারি কোন এঞ্জিনের শব্দ শোনা গেল না। স্লেটার উত্তেজিত, কথা বলার পরিবেশ নয়। তাছাড়া কি বলবে? অর্ধেকটা রুটি রেখে দিয়েছিল বলে নিজেই নিজেকে ধন্যবাদ জানাল এখন কিশোর, চুপচাপ খাচ্ছে ওটা, কথা বলতে হচ্ছে না। উসখুস করছে অন্যেরা।

অবশেষে কিশোরই সহজ করল পরিবেশ। জিজ্ঞেস করল, 'সান্তা মনিকায় থাকেন আপনি, না?'

ঝট করে সোজা হয়ে গেল স্লেটার। হাত চলে গেল বাক্সের ওপর। পরের কয়েকটা সেকেণ্ড তার ডান চোখটা দ্রুত বার বার উঠল নামল। 'কি করে জানলে?' শুকনো কণ্ঠ।

লোকটাকে চমক দিতে চায়নি কিশোর। হাসল। 'না না, তেমন কিছু ভেবে বলিনি। এটা আমার কাছে খেলা, এক ধরনের খেলা,' বুঝিয়ে বলল সে। 'পার্কিং লটে তিনটে গাড়ি দেখলাম। একটার সামনের সীটে একটা খেলনা ভালুক পড়ে আছে। ধরে নিলাম ওটা ওই মহিলার, ওই যে সঙ্গে একটা মেয়ে। আরেকটা গাড়ির ছাতে দেখলাম সার্ফবোর্ড বাঁধা।' সুগঠিত স্বাস্থ্য, রোদে পোড়া বিবর্ণ চুল এক তরুণ কোক খাচ্ছে কাউন্টারের কাছে দাঁড়িয়ে, তাকে দেখিয়ে বলল গোয়েন্দা প্রধান, 'ওই গাড়িটা ওর। কি করে বুঝলাম? স্বাস্থ্য আর চুল দেখেছেন? সার্ফবোর্ড নিয়ে ঢেউয়ের ওপর দিয়ে ছুটে চলা ওকেই মানায়, না?' স্লেটারের দিকে চেয়ে মাথা নাড়ল সে। 'বাকি থাকল আর একটা গাড়ি। সান্তা মনিকার নাম্বার প্লেট।'

নীরবে কিশোরের দিকে চেয়ে আছে স্লেটার। 'চমৎকার খেলা। একেবারে

গোয়েন্দাগিরি।'

'গোয়েন্দাই আমরা,' কথাটা গোপন রাখার প্রয়োজন দেখল না কিশোর। 'এরা দুজন আমার সহকারী।'

পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে স্লেটারের দিকে বাড়িয়ে ধরল সে।

বিড়বিড় করে পড়ল লোকটা, 'কিশোর পাশা, গোয়েন্দাপ্রধান…মুসা আমান, সহকারী গোয়েন্দা…রবিন মিলফোর্ড, নথি গবেষক।…হুঁ,' টেলিফোন নম্বরটাও পড়ল। পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডের নম্বর নয়, তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত টেলিফোন নম্বর। নিজেদের রোজগার থেকে ওটার বিল দেয় ওরা।

'আশ্চর্যবোধক চিহ্নগুলো কেন?' জিজ্ঞেস করল স্লেটার।

'অদ্ভুত সব রকম রহস্যের কিনারা করতে আমরা প্রস্তুত,' বিশেষ বিশেষ সময়ে দুর্বোধ করে কথা বলা কিংবা কঠিন শব্দ ব্যবহার করা কিশোরের স্বভাব।

মাথা ঝাঁকাল স্লেটার। কি ভেবে কার্ডটা রেখে দিল পকেটে। 'খুব বেশি…' থেমে গেল সে।

কি বলতে চেয়েছিল—বেশি রহস্য, বেশি মক্কেল, না বেশি কেস—বোঝা গেল না। লাফিয়ে উঠে গিয়ে দাঁড়িয়েছে জানালার কাছে। ভারি মোটরের গর্জন কানে আসছে। শব্দের অসঙ্গতিই প্রকাশ করে দিচ্ছে, দোষ আছে এঞ্জিনে।

কিশোরও তাকিয়ে আছে জানালা দিয়ে। পাহাড়ী পথের মোড় ঘুরে গোঁ গোঁ করতে করতে আসছে একটা গাড়ি। ড্রাইভারকে জাপানী বলে মনে হলো।

স্লেটারের দিকে ফিরল কিশোর। কিন্তু আগের জায়গায় নেই…দরজার কাছে চলে গেছে। আরেক মুহূর্ত পরেই বেরিয়ে ছুটে যাবে পারকিং লটের দিকে।

সবার আগে লাফ দিয়ে উঠল মুসা। নিয়মিত ব্যায়াম করে, শরীরের ক্ষিপ্রতাও তাই অন্য দুজনের চেয়ে বেশি। মেঝেতে রাখা বাক্সটা থাবা দিয়ে তুলে দৌড় দিল লোকটার পেছনে। 'এই যে, শুনুন,' চেঁচিয়ে ডাকল সে, 'আপনার বাক্স…'

থামল না স্লেটার।

পেছন পেছন দৌড়াল মুসা। কিন্তু দেরি হয়ে গেছে। গাড়িতে উঠে দরজা বন্ধ করছে স্লেটার। স্টার্ট নিয়ে শাঁ করে বেরিয়ে গেল দুই দরজার কালো সিডান গাড়িটা, হাইওয়েতে উঠেই স্পীড বাড়িয়ে দিল।

ফিরে এল মুসা। বাক্সটা নামিয়ে রাখল টেবিলের পাশে।

নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে কিশোর, গভীর ভাবনায় মগ্ন। চিমটি কাটে কেন জিজ্ঞেস করেছে মুসা। কিশোরের জবাব, এতে নাকি তার একাগ্রতা আনতে সুবিধে হয়।

'বাক্সটা ওয়েইট্রেসের কাছে রেখে যাব,' রবিন বলল। 'ব্লিংকি শিওর ফিরে আসবে। ওটা নিতে।'

মুসাও তার কথায় সায় দিল।

কিন্তু কিশোর চুপ। চিমটি কেটেই চলেছে। সবুজ ভ্যান দেখে স্লেটারের অস্বাভাবিক উত্তেজনা কৌতূহলী করে তুলছে তাকে। তার সদা-সন্দিহান মন সব প্রশ্নের জবাব খোঁজে, জবাব না পাওয়া পর্যন্ত নিরস্ত হয় না।

'আমি বলি কি, বাক্সটা হেডকোয়ার্টারে নিয়ে যাওয়া যাক,' অবশেষে মুখ খুলল কিশোর, তার ধারণা আরেকটা রোমাঞ্চকর জটিল রহস্যের সন্ধান মিলতে যাচ্ছে। 'যত্ন করে রেখে দেব। ব্লিংকি যোগাযোগ করবেই। ওর কাছে আমাদের ফোন নম্বর আছে।' প্রতিবাদ করার জন্যে মুসা মুখ খুলতে যাচ্ছে দেখে তাড়াতাড়ি বলল, 'তাছাড়া ওয়েইট্রেসের কাছে বাক্সটা ফেলে যায়নি ব্লিংকি, তাই না? আমাদের কাছে রেখে গেছে। আমাদের বিশ্বাস করেছে?'

'বিশ্বাস না ছাই,' বাধা দিলই মুসা। 'ভুলে ফেলে গেছে।' বলল বটে, কিন্তু জানে সে, কোন লাভ হবে না। একবার যখন সিদ্ধান্ত নিয়ে ফেলেছে কিশোর, বাক্সটা নিয়ে যাবেই।

আধ ঘণ্টা পর, হেডকোয়ার্টারে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা।

পাশা স্যালভিজ ইয়ার্ডে তিরিশ ফুট লম্বা একটা মোবাইল হোম ট্রেলারের ভেতরে ওদের হেডকোয়ার্টার। অনেক দিন আগে পুরানো মাল হিসেবে কিনে এনেছিলেন ওটা কিশোরের চাচা রাশেদ পাশা। এতই বাতিল, বিক্রি করতে পারেননি। জঞ্জালের তলায় চাপা পড়ে গেছে এখন পুরোপুরি। ওটাকেই মেরামত করে ঠিকঠাক করে হেডকোয়ার্টার বানিয়েছে কিশোর, বেরোনো আর ঢোকার জন্যে কয়েকটা গোপন পথ আছে, জানে শুধু ওরাই।

ট্রেলারের ভেতরে সাজানো-গোছানো ছোট্ট একটা অফিস আছে, চেয়ার-টেবিল-ফাইলিং কেবিনেট, সবই আছে তাতে। ডেস্কের ওপর রয়েছে টেলিফোন। ছোট একটা আধুনিক ল্যাবরেটরি, আর ফটোগ্রাফিক ডার্করুমও রয়েছে ট্রেলারে।

সাইকেলের ক্যারিয়ারে করে বাক্সটা এনেছে মুসা, অফিসে ঢুকে নামিয়ে রাখল ডেস্কের ওপর। 'নিয়ে তো এলাম অন্যের জিনিস,' খুশি হতে পারছে না সে। 'কি করবে এখন? খুলে দেখবে?'

ডেস্কের ওপাশে তার সুইভেল চেয়ারে বসেছে কিশোর। মাথা নাড়ল। 'সেটা বোধহয় উচিত হবে না···' থেমে গেল। কুঁচকে গেছে ভুরু। কাত হয়ে কান ঠেকাল অয়েলপেপারে মোড়া বাক্সটার গায়ে।

শুনতে পাচ্ছে তিনজনেই। বাক্সের ভেতর মৃদু ফড়ফড় শব্দ। জীবন্ত কিছু একটা রয়েছে।

'খাইছে!' বলে উঠল মুসা। 'আর ফেলে রাখা গেল না। খুলতেই হচ্ছে।'

জন্তু-জানোয়ারের ভক্ত মুসা। আগে প্রায়ই রাস্তা থেকে ভবঘুরে কুকুর-বেড়াল ধরে নিয়ে আসত পোষার জন্যে। একদিন তো কোথা জানি একটা রোমওঠা, রোগা, বেতো গাধাই ধরে নিয়ে এসেছিল। মুসার মা তার ঠিক উল্টো, দুচোখে দেখতে পারে না জন্তু-জানোয়ার। কুকুর বেড়াল পর্যন্ত সহ্য করেছেন তিনি, কিন্তু গাধাটাকে ঝাঁটাপেটা করে তাড়িয়েছেন, দু-এক ঘা মুসার পিঠেও পড়েছে। এখন বাক্সের ভেতরে নড়াচড়া শুনে তার পুরানো ভালবাসা মাথাচাড়া দিয়ে উঠল, হয়তো পোষার মত কিছু পাওয়া যাবে, এমন কিছু যাতে মা আপত্তি করবেন না।

ফড়াত করে এক টানে বাক্সের কোণের চীজক্লথ ছিঁড়ে ফেলল মুসা। খানিকটা তারের জাল দেখা গেল। পুরো কাগজটাই ছাড়িয়ে নিল সে। জালের খাঁচার

ভেতরে একটা কবুতর।

খুব সুন্দর একটা পাখি। ফুলে থাকা পালক, হাত পাখার মত ছড়ানো লেজ। গাঢ় ধূসর পালকগুলো এত চকচকে, আলাদা একটা উজ্জ্বল বেগুনী আভা ছড়াচ্ছে।

কিশোরই প্রথম লক্ষ করল খুঁতটা, পাখিটার একটা আঙুল নেই। ডান পায়ে তিনটেই আছে, কিন্তু বাঁ পায়ে দুটো।

'এত ছোট খাঁচায় রাখা যাবে না,' বলল মুসা। 'যদি রাখতেই হয়, রেখেই দিই কি বলো? হ্যাঁ, তাহলে বড় আরেকটা খাঁচা বানিয়ে নিতে হবে।'

'হ্যাঁ,' একমত হলো কিশোর। 'চার বাই দুই ফুট ছ-টা জাল লাগবে। কিছু তার কাঁটা, একটা হাতুরি। তক্তা লাগবে কয়েকটা।'

ইয়ার্ডেই পাওয়া গেল সব। পুরানো মালের ডিপো, এসব জিনিসের অভাব নেই। তিন গোয়েন্দার ব্যক্তিগত ওয়ার্কশপে কাজ চলল। কবুতরটার জন্যে আরামদায়ক শক্ত একটা খাঁচা বানিয়ে ফেলল ওরা দেখতে দেখতে।

অফিস থেকে পাখিটাকে নিয়ে এল মুসা। একটা প্লাসটিকের বাকেটে কিছু গমের দানা রেখে খাঁচার ভেতরে ঠেলে দিল কিশোর। পানির বন্দোবস্ত করল রবিন।

ছোট খাঁচা থেকে বের করে বড় খাঁচায় কবুতরটাকে ঢুকিয়ে দিল মুসা। 'যাও, আরাম করে থাকো।'

বেশ সুখী মনে হলো পাখিটাকে। গমের দানা ঠুকরে খেলো কিছুক্ষণ, পানিতে ঠোঁট ডুবিয়ে ঝটকা দিয়ে ওপরের দিকে তুলে তুলে পানি খেতে লাগল। বার দুই বাগবাকুম করে খাঁচার কোণায় গিয়ে পাখার ভেতরে মাথা ঢুকিয়ে বসে পড়ল। তার জন্যে দিন শেষ, ঘুমানোর সময়।

পাখিটাকে ওয়ার্কশপেই রেখে আঙিনায় বেরিয়ে এল ওরা। সাইকেল নিয়ে যার যার বাড়ি রওনা হলো মুসা আর রবিন, কিশোর চলে গেল তার ঘরের দিকে।

পরদিন খুব সকালে ঘুম থেকে উঠল কিশোর। হাতমুখ ধুয়ে কাপড় পরে চলে এল ওয়ার্কশপে।

দানা খাচ্ছে কবুতরটা, ভাবেসাবে মনে হয়, রাতে কোন অসুবিধে হয়নি।

বসে পড়ে খাঁচার তারে নাক ঠেকাল কিশোর। দেখতে দেখতে বলল, 'কোথা থেকে এসেছ? ওই বাক্সে ভরে রেখেছিল কেন তোমাকে ব্লিংকি? এত নার্ভাস দেখাচ্ছিল কেন তাকে?'

কবুতরটাকে ঘিরে কোন একটা ঘোর রহস্য রয়েছে। কি, সেটা ভাবতে ভাবতেই হঠাৎ করে ব্যাপারটা চোখে পড়ল কিশোরের। রহস্যটা আরও ঘনীভূত হলো।

পাখিটার দুই পায়েই এখন তিনটে করে আঙুল।

# দুই

'ওটা বেলজিয়ান রেসিং হোমার,' বলল রবিন। 'মানে, ওই দুটোই।'

নতুন কবুতরটা দেখার পরই গিয়ে দুই সহকারীকে ফোন করেছে কিশোর।

কিন্তু নানা কাজের ঝামেলায় লাঞ্চের পরে ছাড়া আলোচনায় বসতে পারল না ওরা।

রকি বীচ পাবলিক লাইব্রেরিতে পার্ট টাইম চাকরি করে রবিন, সকালে ওখানেই গিয়েছিল। ছুটির পর একটা বই খুঁজে বের করে নিয়ে এসেছে। বই খুলে বেলজিয়ান রেসিং হোমারের রঙিন একটা ছবি দেখাল সে।

ছবিটা দেখল কিশোর। তার সামনে ডেস্কের ওপরই রয়েছে ছোট খাঁচায় ভরা নতুন কবুতরটা, ওটার সঙ্গে ছবি মিলিয়ে দেখল।

'ঠিকই বলেছ,' মাথা দোলাল সে। 'দুটো পাখিই দেখতে অবিকল এক। শুধু যেটা হারিয়েছে, সেটার এক পায়ে আঙুল ছিল দুটো। দুটোই রেসিং হোমার,' বইটা রবিনের দিকে ঠেলে দিল কিশোর।

খাঁচার ফাঁক দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে দিল মুসা, পাখিটার পালকে আঙুল বোলাল।

ব্যাপারটা পছন্দ হলো কবুতরের, ঘাড় কাত করে উজ্জ্বল চোখে তাকাল সে, সহকারী গোয়েন্দার দিকে।

'এখানে প্রায়ই ওরকম ঘটে,' কিশোরের দিকে তাকাল মুসা। 'খেয়াল করোনি? সৈকতের আশেপাশে অনেক বুনো পায়রা দেখেছি, দু-একটা করে আঙুল খোয়া গেছে।'

আনমনে মাথা নোয়াল গোয়েন্দাপ্রধান। খেয়াল করেছে কি করেনি বোঝা গেল না এই ভঙ্গি থেকে। 'ইঁদুর ধরার কল দিয়ে পাখি ধরতে চেষ্টা করে হয়তো লোকে, বেচারা পায়রাগুলোর আঙুল কাটে।' রবিনের দিকে তাকাল সে। 'কিন্তু এগুলোর নাম বেলজিয়ান হোমার হলো কেন?'

কবুতরের বই থেকে মুখ তুলল রবিন। 'ওরা খুব ভাল উড়তে পারে। জন্মায়ই যেন ওড়ার জন্যে, রেসের ঘোড়া যেমন দৌড়ানোর জন্যে জন্মায়। ঘোড়া বিশেষজ্ঞের মত কবুতর বিশেষজ্ঞও আছে, শত শত পাখির মধ্যে থেকেও আসল পাখিটা ঠিক চিনে বের করে ফেলে।' বইয়ের একটা বিশেষ পাতা ঝুড়িতে কিংবা খাঁচায় ভরে—অনেক সময় খাঁচার চারদিকে ঢেকে—নিয়ে যায় ওদেরকে লোকে। পাঁচ-ছয় শো মাইল দূরে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দেয়, পথ চিনে ঠিক বাড়ি ফিরে আসে পাখিগুলো। ঘণ্টায় ষাট মাইল গতিতে উড়তে পারে, একটাও পথ হারায় না।'

আবার বইয়ের দিকে তাকাল সে। 'বেলজিয়ামের জাতীয় খেলা এই কবুতর ওড়ানো। একবার করেছিল কি, একটা রেসিং হোমারকে ঢাকনাওয়ালা ঝুড়িতে ভরে জাহাজের অন্ধকার খোলে করে ইন্দো চায়নায় নিয়ে যাওয়া হয়েছিল। সাত হাজার মাইল পেরিয়ে, চব্বিশ দিন পর দেশে ফিরে এসেছিল ওটা, বেলজিয়ামে। পুরোটাই তার জন্যে অচেনা পথ ছিল।'

'হুঁ,' বিড় বিড় করল কিশোর।

'দেখি,' বইটা নিয়ে মিনিটখানেক পড়ল মুসা। চেঁচিয়ে উঠল, 'খাইছে, খবর আন্না-নেয়ার কাজও দেখছি করে কবুতর। জানতাম না তো। ঐতিহাসিক ব্যাপার-স্যাপার। গল জয় করার সময় সীজার কবুতর ব্যবহার করেছিলেন। আমেরিকান আর্মি বহু বছর ধরে কবুতর কাজে লাগিয়েছে। এই তো কিছুদিন আগে, কোরিয়ার

যুদ্ধেও নাকি কবুতর ব্যবহার হয়েছিল। কাণ্ড! নিয়মিত কবুতর ডাক বিভাগ নাকি ছিল লস অ্যাঞ্জেলেস আর ক্যাটালিনা দ্বীপের মাঝে। কিশোর, তুমি জানো এসব?'

জবাব দিল না কিশোর। নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটছে। খানিকক্ষণ পর বলল, 'প্রশ্ন দাঁড়াচ্ছে, কিভাবে? এবং কেন?'

'বই বলছে, কেউই সঠিক জানে না, কিভাবে পথ চিনে বাড়ি ফেরে ওরা,' মুসার হাত থেকে বইটা নিল রবিন। 'ব্যাপারটা নিয়ে কর্নেল ইউনিভার্সিটিতে অনেক গবেষণা হয়েছে। বিজ্ঞানীদের ধারণা, বায়ুমণ্ডলের চাপের ওপর নির্ভর করে কবুতর। বাতাসের চাপের তারতম্য নিখুঁতভাবে বুঝতে পারে, আর শ্রবণশক্তিও অত্যন্ত প্রখর ওদের। তবে এ-সবই অনুমান। এই যে, এখানে একজন প্রফেসর বলেছেন ঃ পায়রা পথ চিনে কিভাবে বাড়ি ফেরে জানতে হলে ঠিক ওদের মতই হতে হবে আমাদের, ওদের মত অনুভব করতে হবে, ওদের মত করে ভাবতে হবে।'

বন্দি থাকতে পাখিটার কেমন লাগছে, কি ভাবছে এখন, অনুমানের চেষ্টা করল রবিন।

মাথা নাড়ল কিশোর। 'কিভাবে ওরা বাড়ি ফেরে আমি জানতে চাইনি। আমার প্রশ্ন, এই পাখিটা কি করে খাঁচায় এল, আর দু-আঙুলেটাই বা গেল কোথায়? রাতের বেলা এই বদলটা কে করেছে? কি করে জানল, দু-আঙুলেটা কোথায় আছে? আর কেনই বা এই কাজ করল সে?'

'আমার দিকে চেও না,' হাত নাড়ল মুসা, 'কিচ্ছু বলতে পারব না।' টোকা দিয়ে পায়রাটাকে আবার আদর করল সে। মৃদু বাগবাকুম করে পালক ফুলিয়ে তার আদরের জবাব দিল পাখিটা, মনিব আদর করলে কুকুর আর বেড়াল যেমন করে অনেকটা তেমনি। 'একটা নাম দেয়া দরকার। কি রাখা যায়, বলত? টম?'

'এক নম্বর,' মুসার কথা যেন শুনতেই পায়নি কিশোর, 'ব্লিংকি নিজেই পাখিটাকে সরিয়েছে। আমাদের কার্ড আছে ওর কাছে। রকি বীচে আমরা পরিচিত। যে কাউকে জিজ্ঞেস করলেই দেখিয়ে দেবে কিশোর পাশা কোথায় থাকে।'

'হ্যাঁ, তা দেবে,' মুসা মাথা দোলাল।

'নাম্বার টু,' কথা অব্যাহত রাখল কিশোর, 'ব্লিংকি যাকে অনুসরণ করেছে, সেই সবুজ ভ্যানওয়ালাও এ-কাজ করতে পারে। পথের মোড়ে গাড়ি রেখে ঘাপটি মেরে ছিল, মুসার সাইকেলে বাক্সটা দেখে পিছু নিয়ে আমাদের জায়গা চিনে গেছে। তবে এটা ঠিক মেনে নেয়া যায় না। সাইকেলের পেছনে এলে দেখতে পেতাম। তবুও,' গম্ভীর হয়ে তাকাল পাখিটার দিকে, যেন সব দোষ ওটার। 'ব্লিংকি আর তার সবুজ গাড়িটার দিকে, যেন সব দোষ ওটার। 'ব্লিংকি আর তার সবুজ গাড়িঅলা সঙ্গীর সম্পর্কেও কিছু জানি না আমরা। ব্লিংকির ঠিকানা জানি না, শুধু জানি, সান্তা মনিকায় কোথায় থাকে। গাড়ির নাম্বার প্লেটে এমও কে লেখা দেখেছি, এত তাড়াতাড়ি গাড়ি ঘুরিয়ে চলে গেল, নম্বরটা পড়তে পারিনি। সবুজ ভ্যানের প্লেটে কাদা লেগে ছিল, পড়া যাচ্ছিল না। কোন সূত্র নেই আমাদের হাতে, একটা ব্যাপার বাদে।'

'কী?' আগ্রহে সামনে ঝুঁকল মুসা।

'পায়রা। সাধারণ কবুতর নয়। খুব সাবধানে যত্ন করে বড় করা, নিখুঁত ট্রেনিং দেয়া রেসিং হোমার। রেসের ঘোড়ার মত এসব নিয়ে যেসব লোক মাথা ঘামায় তাদের একজন আরেকজনকে চেনার কথা। সম্ভাবনাটা খুবই জোরাল। নিশ্চয় কোন ক্লাব বা সংগঠন রয়েছে যেখানে মিলিত হয় ওরা,' বলতে বলতেই হাত বাড়িয়ে টেলিফোন গাইড টেনে নিল। 'ওই কবুতর পোষে কিংবা ট্রেনিং দেয় এমন কারও খোঁজ পেলে পাখিটা দেখানোও যাবে। চেনে কিনা জানা যাবে...'

'পাখি পাখি করছ কেন?' প্রতিবাদ করল মুসা। 'নাম বললেই হয়। টম নামটা মন্দ কি?'

'হয়তো বলতে পারবে কে এটার মালিক।' হলদে রঙের পাতাগুলো দ্রুত উল্টে চলল কিশোর, সেই সঙ্গে বিড় বিড় করে গেল, 'পি ফর পিজিয়ন···এ ফর অ্যাসোসিয়েশন···সি ফর ক্লাব।' তারপর প্রায় মিনিটখানেক নীরব রইল মুখ, আঙুলগুলো কাজ করেই গেল, তীক্ষ্ণ চোখে পরীক্ষা করল পাতার পর পাতা। অবশেষে হতাশ কণ্ঠে বলল, 'নাহ্ কিচ্ছু নেই। শুধু পি ফর পেট শপ, পোষা পশুপাখির দোকান,' শেষ তিনটে শব্দ বাংলায় বলল।

'কিংবা মিস কারমাইকেল,' রবিন যোগ করল।

গাইড থেকে চোখ তুলল কিশোর। 'এই মিস কারমাইকেলটা কে?'

'প্রায়ই আমাদের লাইব্রেরিতে আসেন। বই যা নেন, সব পাখি সম্পর্কে লেখা। পাখি বলতে পাগল। একবার জিজ্ঞেস করেছিলাম। বললেন, একটা পাখি-সংগঠনের প্রেসিডেন্ট তিনি।'

গাইড বুকটা বন্ধ করে কেবিনেটে রেখে দিল কিশোর। 'তাহলে তাঁকে গিয়ে ধরতে হয়। কবুতর বিশেষজ্ঞ কেউ আছে কিনা হয়তো তিনি জানবেন। মহিলার ঠিকানা জানো?'

'না,' গাল চুলকাল রবিন। 'তবে রকি বীচেই থাকেন, নইলে এখানকার লাইব্রেরিতে আসতেন না। পুরো নামটা অবশ্য জানি, লাইব্রেরি কার্ডে দেখেছি। কোরিন কারমাইকেল।'

নামটা গাইড বুকে সহজেই খুঁজে পেল কিশোর। হ্যাঁ, রকি বীচেই থাকেন মহিলা, মাইল দুয়েক দূরে, অ্যালটো ড্রাইভে।

'সাইকেল নিয়েই যেতে পারি,' মুসা বলল। 'কিন্তু টমকে কি করব?'

'কি টম টম করছ?' বলল কিশোর। 'কবুতরের আর কোন নাম খুঁজে পেলে না।'

'কেন মন্দ কি? মানুষের নাম টম, কুকুর-বেড়াল-ছাগল-শুয়োর-ঘোড়া সব কিছুর নামই যদি টম হতে পারে, কবুতরের বেলায় অসুবিধে কি?'

'হুঁ,' মুসার *অকাট্য* যুক্তির পর আর তর্ক করল না কিশোর। কিন্তু কবুতরটাকে সঙ্গে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে আপত্তি জানাল।

'কোথায় রেখে যাব তাহলে?' বলল মুসা।

'এখানেই···'

'খুব কষ্ট পাবে। তারচে বাইরের বড় খাঁচাটায়···'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'চুরির ভয় আছে। গত রাতের কথা ভুলে গেছ?'

'তাহলে নিয়ে যাওয়াই ভাল।'

'আমারও তাই মনে হয়,' মুসার পক্ষ নিল রবিন। 'নইলে ফিরে এসে হয়তো দেখব তিন আঙুলের জায়গায় চার আঙুলওলা আরেকটা পায়রা বসে আছে।'

ভোটে হেরে যাচ্ছে কিশোর, কি ভেবে রাজি হয়ে গেল সঙ্গে নিতে।

দুই সুড়ঙ্গের মুখের ঢাকনা সরিয়ে খাঁচাটা নিয়ে নামল মুসা। তার পেছনে রবিন।

নামার জন্যে এগিয়েও থমকে গেল কিশোর, ভ্রূকুটি করে ফিরল। ডেস্কের কাছে এসে তার নতুন আবিষ্কার ফোন-এলে-জবাব-দেয়ার মেশিনটার সুইচ অন করে দিল। তারপর এসে নামল দুই সুড়ঙ্গে।

রকি বীচের পুব প্রান্তে অ্যালটো ড্রাইভ। ধনী মানুষের পাড়া। অনেক জায়গা নিয়ে বিশাল সব বাড়ি। রাস্তার ধারে গেট, গেটের পরে একরের পর একর জুড়ে বাগান, লন আর গাছপালার পরে রয়েছে বাড়িগুলো, কোনটা আংশিক চোখে পড়ে, কোনটা গাছের জঙ্গলের ওপাশে একেবারেই অদৃশ্য।

লোহার মস্ত এক সদর দরজার সামনে সাইকেল থেকে নামল তিন গোয়েন্দা। গেটের পাশে কংক্রিটের থামে বসানো শ্বেত পাথরের ডিম্বাকৃতি ফলক, তাতে কুচকুচে কালো হরফে লেখা রয়েছে ঃ মিউজিক নেস্ট।

'এটাই,' বলল কিশোর।

আরেক পাশের থামে খোপ কেটে তাতে ইনটারকম সিসটেম বসান হয়েছে। সুইচ টিপে যন্ত্রটার সামনে দাঁড়াল কিশোর জবাব দেয়ার জন্যে। কিছুই শোনা গেল না। আবার সুইচ টিপে যন্ত্রটায় কান ঠেকাল সে।

জবাব এলেও কথা বোঝা যাবে কিনা সন্দেহ। মিউজিক নেস্টের আশেপাশে অনেকখানি জায়গা জুড়ে যে হারে কলরব আর হই চই। চেঁচিয়ে কথা বলেও একে অন্যের কথা ঠিকমত শুনতে পাবে না।

অবস্থা অনেকটা বড় সড় ইলেকট্রনিক মার্কেটের মত। পুরো ভলিয়ুমে বাজানো রেডিও আর টেপ-রেকর্ডারের মিউজিকের শব্দে ওখানে যেমন টেকা দায়, এখানেও তেমনি অবস্থা। তফাত শুধু মার্কেটে মানুষের কণ্ঠ আর নানারকম বাদ্যযন্ত্রের বাজনা, এখানে পাখির কলরব। শিস, কিচির-মিচির, তীক্ষ্ণ একঘেয়ে চিৎকার, কা-কা, সব মিলিয়ে সে এক এলাহি কাণ্ড।

আবার সুইচ টিপল কিশোর। জবাবে কিছু একটা শোনাও গেল, কিন্তু বোঝা গেল না। আর ঠিক সেই মুহূর্তে কর্কশ ডাক ছেড়ে আকাশে উড়ল একঝাঁক টিয়ে।

ইনটারকমের কাছ থেকে সরে এল কিশোর, বিরক্ত চোখে তাকাল গাছপালার মাথার ওপরে উড়ন্ত পাখিগুলোর দিকে। গাছের ডালে অসংখ্য কাকাতুয়া, উজ্জ্বল লাল, হলুদ আর নীলের মাঝে গাছের ঘন সবুজ পাতাও ফেকাসে দেখাচ্ছে। টিয়েগুলোর সঙ্গে পাল্লা দিয়েই যেন কণ্ঠস্বর আরও উঁচু পর্দায় তুলে দিল কাকাতুয়ার দল।

'পাখি!' চেঁচিয়ে বলল মুসা। 'পুরো এলাকাটা পাখিতে...' শেষ শব্দটা বোঝা

গেল না, টিয়েগুলো সমস্বরে আবার চেঁচিয়ে উঠেছে।

'ভরা,' মুসার চেয়েও জোরে বলল কিশোর। শুধু কাকাতুয়া আর টিয়েই নয়, স্টারলিং, ক্যানারি, লার্ক, চড়ুই, কাক, চিল, শকুন, বাজ, দোয়েল, বুলবুল, কোন পাখিরই অভাব নেই এখানে। ডালে বসে চেঁচাচ্ছে কেউ, কেউ লাফালাফি করছে, কেউ এক ডাল থেকে আরেক ডালে উড়ে যাচ্ছে ফুরুত করে, কেউ বা আবার মহা গম্ভীর হয়ে বসে রয়েছে চুপচাপ।

বাড়ির ভেতরে ঢোকার পথ খুঁজল কিশোর। গেটের পাল্লায় শুধু খিল লাগানো, তালা-টালা নেই। শিকের ফাঁক দিয়ে হাত ঢুকিয়ে খিল তুলে ফেলল। পাহারাদার কেউ আছে কিনা তাকিয়ে দেখল এপাশ-ওপাশ। নির্জন। সাইকেল নিয়ে ঢুকে পড়ল সে ভেতরে।

অন্য দুজনও ঢুকল। পাল্লা ঠেলে লাগিয়ে আবার জায়গা মত খিলটা তুলে দিল মুসা। 'এবার কি?' কিশোরের কানে মুখ ঠেকিয়ে জিজ্ঞেস করল।

গাছপালার ভেতরে দিয়ে এঁকেবেঁকে যাওয়া গাড়িচলা পথটা দেখাল কিশোর, সাইকেল চালিয়ে যাওয়ার ইঙ্গিত করল।

এগিয়ে চলেছে তিন গোয়েন্দা। কলরব সামান্যতম কমেনি, বরং বাড়ছে বলে মনে হলো ওদের। ওই প্রচণ্ড শব্দ বেশিক্ষণ আর সইতে পারল না রবিন, হ্যাণ্ডেল ছেড়ে দিয়ে দু-হাতে কান ঢাকল, শুধু পা আর কোমরের সাহায্যে ব্যালান্স করে সাইকেল চালাচ্ছে।

আগে আগে ছিল কিশোর, হঠাৎ থেমে গেল। গাছগাছালি আর পঙ্গপালের মত পাখির ঝাঁকের ফাঁক-ফোকর দিয়ে একটা বিশাল বাড়ির খানিকটা চোখে পড়ছে। কিন্তু বাড়ি দেখে থমকায়নি সে, অন্য কারণ।

পাখির কলকাকলী ভেদ করে কানে আসছে আরেকটা কণ্ঠ, মহিলা কণ্ঠের গান; তীক্ষ্ণ, উঁচু পর্দা, কিন্তু শুনতে খারাপ লাগে না। নরম গলায় গাইলে আর এত সব কোলাহল না থাকলে বেশ মিষ্টিই শোনাবে।

আরেকটু আগে বাড়ল ওরা।

আবার গান গাইল মহিলা, কথাগুলো বোঝা গেল এবার : তিনটে ছেলে ড্রাইভওয়েতে, কি চাই ওদের, কি চাই।

সুরটা পরিচিত মনে হলো রবিনের। ও, মনে পড়েছে। দি ব্যাটল হাইম অভ দা রিপাবলিক।

'আসছে ওরা আরও কাছে,' গেয়েই চলেছেন মহিলা, 'আসছে ওরা আসছে গো। ভয় পেয়ো না মিষ্টি পাখি, ভয় পেয়ো না লক্ষ্মীরা। হয়তো ওরা কোনই ক্ষতি করবে না-কো তোমাদের।'

সাইকেল থেকে নেমে হ্যাণ্ডেল ধরে ঠেলে নিয়ে চলল তিন কিশোর।

গাছের জঙ্গল আর বাড়ির মাঝের ছড়ানো লনে দাঁড়িয়ে আছেন মাঝবয়েসী মহিলা। সাধারণের চেয়ে বেশিই লম্বা। গরমকালের ঢোলা হালকা পোশাক পরনে। মাথায় নরম হ্যাট, চওড়া কানা। গোলগাল বেশ সুন্দর চেহারা।

তাঁর কাঁধে বসে আছে একটা তোতা, হ্যাটের চাঁদিতে শুয়ে ঝিমাচ্ছে একটা

ক্যানারি। আর ঠিক মাথার ওপরে শূন্যে ফড়ফড় করে ডানা ঝাপটাচ্ছে একটা বাজ, বসার সুবিধেমত জায়গা খুঁজছে।

'কথা কিছু থাকলে বলার, বলো শুনি গান গেয়ে,' তিন গোয়েন্দা একেবারে কাছে চলে এল বললেন মহিলা। 'দরাজ গলায় গাইবে গান, নইলে কানে ঢুকবে না, কিছুই কানে ঢুকবে না।'

পাগলের পাল্লায় পড়েছে, কোন সন্দেহ নেই মুসার, জরুরী অবস্থায় পালানোর জন্যে তৈরি হয়ে রইল। রবিন চুপ। বার বার তাকাচ্ছে কিশোরের দিকে।

কিশোর বুঝল, জবাব তাকেই দিতে হবে। খুব ভাল অভিনেতা সে, শিশুকালেই টেলিভিশনে অভিনয় করে অনেক সুনাম-কুড়িয়েছে, কিন্তু গানের ব্যাপারে সে আনাড়ি। কখনও গলা সেধে দেখেনি। এমনকি বাথরুমেও কখনও গুনগুন করেছে কিনা মনে পড়ে না। সমস্যায় পড়ে গেল। মনে মনে গুছিয়ে নিল শব্দগুলো কবিতার মত করে, তারপর হেঁড়ে গলায় গান ধরল : মিস কোরিনকে খুঁজি মোরা, পাখির যিনি বিশারদ; আপনি কি সেই…আপনি কি সেই…ইয়ে মানে… ইয়ে…তাল ছন্দ কথা সব হারিয়ে তোতলাতে শুরু করল গোয়েন্দাপ্রধান।

হা-হা করে হেসে উঠেই রবিনের কনুইয়ের গুঁতো খেয়ে আঁউক করে থেমে গেল মুসা। বোধহয় শুনতে পাননি মহিলা, তাই ফিরে তাকালেন না। কিশোরের কথার জবাব দিলেন 'আমিই সেই মিস কোরিন, খুঁজছ যাকে তোমরা।'

আবার কিশোরের পালা। কেশে গলা পরিষ্কার করে নিল সে, অসহায় ভঙ্গিতে তাকাল মিস কারমাইকেলের দিকে। সুর করে বলল, 'অনুপ্রবেশ করেছি বলে আমরা সবাই দুঃখিত।' দি ব্যাটল হাইম অভ দ্য রিপাবলিক ঠিক রাখতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে সে। 'কিন্তু কোন ছিল না উপায়…' থেমে গেল সে। না, কথা আটকে যায়নি, তার প্রতি মনোযোগ হারিয়েছেন মহিলা, চেয়ে রয়েছেন মুসার হাতের খাঁচাটার দিকে।

হাসলেন মিস কারমাইকেল, আন্তরিক হাসি, নেচে নেচে এগোলেন মুসার দিকে।

এক লাফে পিছিয়ে গেল মুসা। দ্রুত একবার তাকাল দু-পাশে। কোনদিকে দৌড় দিলে সুবিধে হবে আন্দাজ করল।

কিন্তু দৌড় দিতে হলো না। তার আগেই গান গেয়ে উঠলেন মহিলা, 'সোনা আমার, লক্ষ্মী সোনা, কি চমৎকার দেখিতে। টিট্‌টিরিংনা টিট্‌টিরিংনা টিট্‌টিরিংনা টিট্‌টিরিং।' বলেই কবুতরের গলা নকল করে বাগবাকুম করে উঠলেন।

ছোঁ মেরে মুসার হাত থেকে খাঁচাটা ছিনিয়ে নিলেন মিস কারমাইকেল। বুকে জড়িয়ে ধরে আবার গাইলেন, 'সোনা আমার, লক্ষ্মী সোনা, দেব ওদের পুরস্কার। টিট্‌টিরিংনা টিট্‌টিরিংনা…'

# তিন

'কি পুরস্কার…' গেয়ে উঠে আবার থেমে গেল কিশোর, তার দিকে খেয়ালই নেই

মহিলার, খাঁচার দরজা খুলছেন।

'প্লীজ,' চেঁচিয়ে উঠল কিশোর, 'প্লীজ, খুলবেন না।' তারপর যথাসম্ভব ভদ্রভাবে মিস কারমাইকেলের হাত থেকে নিয়ে নিল খাঁচাটা। বলল, 'মনে কিছু করবেন না, এটা আমাদের পায়রা না।'

এরপর কি বলবে? মনে মনে ছন্দ সাজাতে গিয়ে সমস্যায় পড়ে গেল কিশোর। ব্যাখ্যা করে বোঝানো এক কথা, আর সেটা গান গেয়ে শোনানো, তা-ও আবার ব্যাট্ল্ হাইমসের সুর, নাহ্, অসম্ভব। পারবে না। জোরে জোরে চেঁচিয়ে এমননিতেই গলা-মুখ ব্যথা হয়ে গেছে, আর বেশিক্ষণ এই অবস্থা চালালে কথাই বলতে পারবে না শেষে।

ব্যাট্ল্ অভ হাইমসের ধার দিয়েও আর গেল না কিশোর, কিছু মনে করলে করুনগে মহিলা, সে না পারলে কি করবে? নিজেই একটা বেসুরো সুর বানিয়ে নিয়ে চেঁচাল, 'এখানে আর পারছি না, আর কোথাও চলুন না। অনেক কথা বলার আছে, দয়া করে শুনবেন কি?'

গলায় ঝোলানো তিননরী মুক্তার হারটায় আঙুল বোলাচ্ছেন মহিলা, ছেলেদের দেখছেন। কিশোর ওভাবে খাঁচাটা নিয়ে নেয়ায় মনে আঘাত পেয়েছেন তিনি, তবে প্রকাশ করছেন না।

কিশোরের কথায় মাথা ঝাঁকালেন, ইঙ্গিত করলেন বাড়ির দিকে। ঘুরে হাঁটতে শুরু করলেন। মাথার ওপর চক্কর দিচ্ছিল বাজ পাখিটা, কাঁধে বসার আর সুযোগ হবে না বুঝে গিয়ে বসল একটা ডালে। কাঁধের তোতাটা তেমনি বসে আছে, হ্যাটে বসা ক্যানারি ঝিমাচ্ছে আগের মতই।

মিস কারমাইকেলকে অনুসরণ করে বড় একটা জানালা গলে একটা ঘরে ঢুকল তিন গোয়েন্দা। বিরাট বসার ঘর, প্রচুর আলো। আরও কয়েকটা জানালা রয়েছে, তবে সবগুলোই পুরু কাচে ঢাকা।

খোলা জানালার কাচের পাল্লা বন্ধ করে দিলেন মিস কারমাইকেল। বাইরের কোলাহল তাতে কিছুটা কমল। দেয়ালে বসানো একটা বোতাম টিপলেন। জানালার ফ্রেমের ওপরের একটা খাঁজ থেকে নেমে এল পুরু কাচের পর্দা, ফ্রেমের নিচের দিকের খাঁজে শক্ত হয়ে বসে গেল। সঙ্গে সঙ্গে থেমে গেল কোলাহল, নীরব হয়ে গেল ঘর।

চমৎকার ব্যবস্থা, ভাবল মুসা, একেবারে সাগরের তলার নীরবতা। স্কুবা ডাইভিঙের সময় এই নীরবতা খুব লাগে তার, খুব উপভোগ করে। প্রচণ্ড শব্দের পর এই হঠাৎ নীরবতায় হাঁপ ছাড়ল ছেলেরা।

'পায়রাটাকে ছেড়ে দিচ্ছ তাহলে?' স্বাভাবিক কণ্ঠে বললেন মিস কারমাইকেল, কিশোরের দিকে চেয়ে।

কিশোর বুঝল, বাইরে পাখিদের সঙ্গে একাত্মতা রক্ষার জন্যেই গানের মত করে কথা বলেন তিনি।

কিশোর জবাব দেয়ার আগেই বললেন মিস কারমাইকেল, 'আমি ভেবেছিলাম ওটাকে এখানে ছেড়ে দেয়ার জন্যে এনেছ। হ্যাণ্ডবিল ছেড়েছি আমি, পত্রিকায়

ঘোষণা দিয়েছি, কেউ খাঁচায় বন্দি কোন পাখি এনে এখানে ছাড়লে প্রতিটা পাখির জন্যে বিশ ডলার করে পুরস্কার দেব। বন্দি পাখি দেখলে বড় কষ্ট হয় আমার। এ ভারি নিষ্ঠুরতা।'

'নিষ্ঠুর!' প্রতিধ্বনি করল যেন তাঁর কাঁধে বসা তোতাটা। 'নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর!'

পুরস্কারের ব্যাপারটা পরিষ্কার হলো ছেলেদের কাছে।

কিশোর জানাল মিস কারমাইকেলকে, কবুতরটা তাদের নয়। কিভাবে কোথায় পাওয়া গেছে, খুলে বলল। এখন পাখিটাকে তার আসল মালিকের কাছে ফিরিয়ে দিতে চায়।

মিস কারমাইকেলের সঙ্গে কোন একজন অভিনেত্রীর অনেক মিল আছে, ভাবছে রবিন, নামটা মনে করতে পারছে না।

কিশোরের কথা শেষ হলে মুখ খুলল মুসা, 'আসল মালিকের কাছে টমকে ফিরিয়ে দিতে চাই। আমার বিশ্বাস, ছেড়েই রাখা হবে ওকে।'

'টম?' গলার মুক্তোর হারে আঙুল বোলাচ্ছেন মিস কারমাইকেল। 'এটা কি রকম নাম হলো? না না, পাখির এমন নাম হওয়া উচিত না। তার চেয়ে অন্য কিছু রাখো, এই যেমন কোন ধাতু কিংবা মূল্যবান পাথরের সঙ্গে মিলিয়ে। ওটার পালক নীলচে তো…এক কাজ করো, কোবাল্ট রাখো…'

'দূর!' নাক কোঁচকাল মুসা।

'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' একটা বিচ্ছিরি কিছু না ঘটে যায়, এই ভয়ে তাড়াতাড়ি হাত তুলে বাধা দিল রবিন, 'নাম একটা হলেই হলো। কোবাল্ট নামটাও খারাপ না। কি বলো কিশোর?'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম,' রবিনের কথার জবাব দিল না কিশোর। 'ম্যাডাম, রবিনের কাছে শুনলাম,' রবিনকে দেখাল সে, 'লাইব্রেরিতে নাকি পাখি নিয়ে ওর সঙ্গে আপনার আলোচনা হয়েছে। ভাবলাম, আপনার কাছেই খোঁজ পাওয়া যাবে, তাই ছুটে এসেছি। রেসিং হোমারকে ট্রেনিং দেয় এমন কাউকে চেনেন?'

জবাব দিলেন না মিস কারমাইকেল। ছেলেদের পেছনে জানালার দিকে নজর। 'এক মিনিট,' বলেই এগিয়ে গিয়ে দেয়ালে বসানো বোতাম টিপে জানালার কাচের পর্দা উঠিয়ে দিলেন। ঘরের ভেতর ঝাঁপিয়ে এসে পড়ল যেন প্রচণ্ড কোলাহল।

জানালার পাল্লা খুললেন তিনি। পথের ওপর দাঁড়িয়ে আছে একটা পাখি। একটা দোয়েল। জানালা খুলতেই উড়ে এসে বসল চৌকাঠে।

পাখিটার ঠোঁট থেকে কি একটা জিনিস নিলেন মিস কারমাইকেল।

'আহা, কি বুদ্ধিমান বন্ধু আমার,' গান গেয়ে উঠলেন তিনি। 'তাই তো ওকে ডাকি হীরা।'

পাখিটা উড়ে বাগানের দিকে চলে গেল।

আবার জানালা বন্ধ করে কাচের পর্দা নামিয়ে দিলেন মিস কারমাইকেল। ছেলেদের কাছে এসে বললেন, 'চুরি করা দোয়েল পাখির স্বভাব। তবে আমার পাখি দুটো এমন নয়। হীরা তো খাঁটি হীরা, অন্য দোয়েলটাও ভাল। চুরিদারি একদম করে না, তবে কোথাও কিছু পড়ে থাকলে হীরার সেটা কুড়িয়ে নেয়া চাই-ই। কত সুন্দর

সুন্দর জিনিস যে সে এন দেয় আমাকে। এই দেখো।'

মাংসল সাদা হাতের মুঠো খুলে দেখালেন তিনি হীরা কি এনেছে।

মস্ত একটা মুক্তো, ঝকমক করছে।

'এই নিয়ে তিনটা হলো,' বললেন তিনি, 'এক মাসে তিনটা মুক্তো এনেছে।' কোথায় পায় কে জানে। মুক্তো আমি খুব ভালবাসি। পাখি আর মুক্তো।'

'হ্যাঁ, যা বলছিলাম,' আবার আগের কথা তুলল কিশোর। 'রেসিং হোমারকে ট্রেনিং দেয়...'

মাথা নাড়লেন মিস কারমাইকেল। 'না, তেমন কারও কথা মনে পড়ছে না।'

'আচ্ছা, ঠিক আছে, যদি মনে পড়ে...' পকেট থেকে একটা কার্ড বের করে বাড়িয়ে ধরল কিশোর, 'দয়া করে এই নাম্বারে ফোন করে জানালে খুব খুশি হব।'

কার্ডটা ধরলেন মিস কারমাইকেল, কিন্তু পড়তে পারলেন না। তার আগেই ডাইভ দিয়ে নেমে এল তোতা, কার্ডটা ঠোঁটে করে নিয়ে গিয়ে বসল আবার আগের জায়গায়।

'আপনার অনেক সময় নষ্ট করলাম, থ্যাংকিউ,' বলল কিশোর। মহিলাকে পছন্দ করতে শুরু করেছে সে। তবে যে কাজে এসেছিল, তার কিছুই হয়নি, কোন রকম সাহায্য হলো না। সাউণ্ডপ্রুফ এই ঘরটাকে এখন একটা খাঁচা মনে হচ্ছে তার, এখান থেকে বেরিয়ে যেতে পারলে বাঁচে।

জানালার কাচের পর্দা সরিয়ে পাল্লা খুলে দিলেন মিস কারমাইকেল। একে একে বেরিয়ে এল ছেলেরা মহাকোলাহলের মধ্যে। একবার ফিরে তাকাল কিশোর, তাদের দিকে নজর নেই মহিলার। হাতের মুক্তোটা দেখছেন, মুখে হাসি।

ড্রাইভওয়ে ধরে সাইকেল চালিয়ে ফিরে চলল তিন গোয়েন্দা। এখানে কথা বলার চেষ্টা বৃথা। দূরে গিয়ে তারপর যা বলার বলবে, ভাবল কিশোর। পাখির কলরব কান ঝালাপালা করে দিচ্ছে, অসহ্য লাগছে তার।

হঠাৎ তীক্ষ্ণ চিৎকারে থেমে গেল কিশোর। প্রথমে ভেবে ছিল পাখির ডাক, কি ভেবে ফিরে তাকাল বাড়ির দিকে। পাখি নয়, বাজ পাখির গলা নকল করে চেঁচিয়ে উঠেছেন মিস কারমাইকেল, কিশোর ফিরে তাকাতেই হাত তুলে ডাকলেন।

'আমার এক বন্ধু আছে,' গাইলেন মিস কারমাইকেল, 'রিচার্ড হ্যারিস নামটি তাহার, বাস করে এই শহরেই; পায়রা পোষার শখ ছিল তার, বলেছে সে একদিন। কি আফসোস, ভুলেই ছিলাম, কি আফসোস, ভুলেই ছিলাম।'

'থ্যাংকিউ, মিস কারমাইকেল,' বলল কিশোর। 'রিচার্ড হ্যারিস নামটি আমি আর সহজে ভুলব না,' শেষের কথাগুলো সুর করে বলল।

# চার

'রিচার্ড হ্যারিস,' মিউজিক নেস্ট থেকে দূরে মহাসড়কের শান্ত পরিবেশে ফিরে এসে বন্ধুদেরকে বলল কিশোর, 'মেইন স্ট্রীটের একটা অলঙ্কারের দোকানের নাম।'

পথের ধারে ঘাসের ওপর সাইকেল নিয়ে এল সে, সাইকেল থেকে নামল।

রবিন আর মুসাও নামল।

'শোনো,' মুসা প্রস্তাব দিল, 'এত সব ঝুট ঝামেলা না করে চলো আবার মিস কারমাইকেলের বাড়িতে ফিরে যাই। তার সামনে খাঁচা থেকে ছেড়ে দিই টমকে। কুড়ি ডলার নিয়ে ফিরে আসব। ছাড়া পেলেই বাড়ি ফিরে যাবে টম, তার বন্ধুদের কাছে। আমাদেরও ঝামেলা শেষ।'

এই আশঙ্কাই করছিল কিশোর। তবে একেবারে মন্দ বলেনি মুসা, অন্তত পাখিটার পক্ষ থেকে ভাবলে সেটা করাই ভাল। কেন খাঁচায় বন্দি রেখে কষ্ট দেয়া? ছাড়া পেলে নিজের ঝাঁকে বন্ধুদের মাঝে ফিরে যেতে পারবে।

কিন্তু এই পায়রাটাই এখন একমাত্র সূত্র রহস্যভেদী কিশোর পাশার কাছে, হাতছাড়া করতে সায় দিচ্ছে না তার মন। চমৎকার একটা রহস্য দানা বেঁধে উঠেছে, শুরুতেই দেবে সব ভণ্ডুল করে, এটা ভাবতে পারছে না।

হেডকোয়ার্টারে চালু করে দিয়ে আসা জবাব-দেয়ার যন্ত্রটার কথা ভাবল কিশোর। সবুজ গাড়িওয়ালা লোকটা আগের কবুতরটাকে চুরি করে থাকলে, আর সেটা স্লেটারের জানা না থাকলে শিগগিরই ফোন করবে। দু-আঙলাকে ফেরত চাইবে। নিতে আসবে। তখন তার সামনে থাকতে চায় কিশোর। দেখতে চায়, তিন-আঙলাকে দেখে কি প্রতিক্রিয়া হয় স্লেটারের। চিনতে পারে কিনা কবুতরটাকে।

'এখুনি ছেড়ে না দিয়ে,' বলল কিশোর, 'আগে রিচার্ড হ্যারিসের সঙ্গে দেখা করে নিই। যাওয়ার সময় পথেই পড়বে তার দোকান। রবিন, তুমি কি বলো?'

'ঠিক আছে,' অনিচ্ছা সত্ত্বেও বলল মুসা, 'তোমরা যখন চাও···হ্যালো, মিস্টার রিচার্ড হ্যারিস, আসিতেছি আমরা।'

রকি বীচের সব চেয়ে দামী অলঙ্কারের দোকান 'রিচার্ড হ্যারিস'—মালিকের নামে নাম। খরিদ্দার আকৃষ্ট করার জন্যে বাইরের শো-কেসে ঘড়ি কিংবা আঙটির মত শস্তা জিনিস নেই। আছে কুচকুচে কালো মখমলে মোড়া ধাতব স্ট্যাণ্ডে ঝোলানো মুক্তার অনেক দামী একটা হার, আর সেটার দুপাশে বেশ কায়দা করে আটকানো হীরের দুটো ব্রৌচ। উজ্জ্বল দিবালোকে ঝলমল করে জ্বলছে, যেন নীরবে ঘোষণা করছে ঃ আমাদের দেখেই অবাক হয়ে গেলেন? ভেতরে এসে দেখুন না, আরও কত কি আছে।

ভেতরে অনেকগুলো কাচের বাক্স সাজানো। ভেতরে দামী দামী সব গহনা।

বড় একটা বাক্সের ওপাশে দাঁড়ানো একজন লোক। বেঁটে গাঁট্টাগোট্টা শরীর, গায়ে কালো কোট, পরনে কড়া ইস্তিরী করা ডোরাকাটা প্যান্ট। সিল্কের টাই আর শক্ত মাড় দেয়া কলারও মনে হচ্ছে আছে পরনে, তবে সেটা দেখা যায় না দাড়ির জন্যে। লম্বা কালো দাড়ি মুখের পুরোটাই প্রায় ঢেকে দিয়েছে, শুধু নাক আর চোখ দেখা যাচ্ছে। ঘন জঙ্গলের মাঝে খোলা জায়গার মত ঠোঁট দেখা যায়, তবে অস্পষ্ট।

'বলো?' তিন গোয়েন্দাকে ঢুকতে দেখে প্রশ্ন করল লোকটা।

'মিস্টার রিচার্ড হ্যারিস?' জানতে চাইল কিশোর

'হ্যাঁ।'

কিশোর জানাল, তারা মিস কোরিন কারমাইকেলের বন্ধু। মহিলার নাম শুনেই উজ্জ্বল হয়ে উঠল হ্যারিসের চোখ।

বলে গেল কিশোর, কারমাইকেলের কাছেই মিস্টার হ্যারিসের নাম শুনেছে ওরা। একটা বেলজিয়ান রেসিং হোমার নিয়ে এনেছে। দেখে দয়া করে যদি মিস্টার হ্যারিস জানান কবুতরটা কার (যদি অবশ্য চিনতে পারেন) তো সারা জীবন কৃতজ্ঞ থাকবে কিশোর, ইত্যাদি ইত্যাদি।

'আরে না না, কে বলে আমি বিশারদ,' বিনয়ে গলে গেল মিস্টার হ্যারিস। 'একবার কবুতর পোষার শখ হয়েছিল, চেষ্টা করেছিলাম। ভাল লাগেনি, ছেড়ে দিয়েছি। সে অনেক বছর আগের কথা।' মুসার হাতের খাঁচার দিকে তাকাল। 'ওটাই নাকি?'

'হ্যাঁ,' খাঁচাটা ওপরে তুলল মুসা, হ্যারিসকে ভালমত দেখানোর জন্যে।

মিনিটখানেক নীরবে পাখিটাকে দেখল হ্যারিস, জিজ্ঞেস করল, 'পেলে কোথায়? তোমাদের কাছে এল কি করে?'

'আমাদের বাড়িতে কে জানি ফেলে রেখে গেছে,' স্লেটারের কথা চেপে গেল কিশোর।

'কে?'

'জানি না,' মুসাা জবাব দিল। 'সকাল বেলা পেলাম। সে জন্যেই এসেছি আপনার কাছে। ভাবলাম, আপনি হয়তো জানেন…'

মাথা নাড়ল হ্যারিস। 'বেলজিয়ান রেসিং হোমার নয় এটা। মানে, হোমারই, তবে রেসার বলা চলে না। মেয়ে পাখি তো, রেস দেয় না।'

'কিন্তু…' বলতে গিয়েও কি ভেবে থেমে গেল রবিন। চুপ হয়ে গেল।

'তাহলে বলতে পারছেন না এটা কার?' জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'না,' আবার মাথা নাড়ল হ্যারিস। মনে হলো, হাসছে।

ঠোঁট পুরোপুরি দেখা যায় না তো, ঠিক বোঝা গেল না। 'সরি, তোমাদের সাহায্য করতে পারলাম না। মিস কারমাইকেলকে আমার সালাম জানিও।'

জানাবে, বলল কিশোর। মূল্যবান সময় নষ্ট করে তাদের কথা শোনার জন্যে বার বার ধন্যবাদ দিল মিস্টার হ্যারিসকে।

দোকান থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা।

ফুটপাথে তুলে রাখা সাইকেলগুলো স্ট্যাণ্ড থেকে নামাল। সাইকেলের ক্যারিয়ারে খাঁচাটা বসিয়ে বাঁধছে মুসা। মোড়ের ওপাশ থেকে বেরোল একটা কালো গাড়ি, ওদের পাশ দিয়ে গেল।

সাইকেলে চড়তে যাচ্ছিল মুসা আর কিশোর, থামাল রবিন। ইশারা করল অলঙ্কারের দোকানের দিকে।

'কি?' ভুরু কোঁচকাল কিশোর।

'ওই লোকটা,' আবার দোকানের দিকে হাত তুলল রবিন, 'রিচার্ড হ্যারিস। হয় কবুতরের ক-ও জানে না সে, কিংবা মিছে কথা বলেছে'

'কেন? মিছে বলবে কেন?' মুসা বলল।

'জানি না। সকালে লাইব্রেরি থেকে যে বইটা এনেছি, তাতে লেখা আছে, পুরুষ-মেয়ে নিয়ে কোন কথা নেই, ট্রেনিং পেলে সব হোমারই রেসার হতে পারে। বেশ কয়েকবার ওয়ার্ল্ড চ্যাম্পিয়ন হয়েছে মেয়ে কবুতর।'

ঘড়ি দেখল কিশোর। 'ডিনারের সময় হয়ে গেছে। চলো বাড়ি যাই। খাওয়ার পর হেডকোয়ার্টারে বসে আলোচনা করব।'

'ঠিক বলেছ,' মাথা দোলাল মুসা, 'আগে খাওয়া, তারপর অন্য সব। কিন্তু এই টমকে যদি রাখতেই হয়...'

'মেয়ে তো,' হেসে বলল রবিন, 'টম আর হয় কি করে? টমনী রাখো।'

'ছেলে হোক মেয়ে হোক, নাম একবার রেখে ফেলেছি, ব্যস। টমই সই। অনেকেই ছেলের নাম রাখে মেয়েদের, মেয়ের নাম ছেলেদের। আমাদের জরজিনা বেগমের কথাই ধরো না, জিনা শুনতে নাকি তার ভাল লাগে না, বলে জর্জ।'

'ঠিক আছে, বাবা টমই, যাও,' হাত তুলল রবিন।

'যা বলছিলাম, টমকে যদি রাখতেই হয়, নিরাপদ জায়গায় রাখতে হবে। হেডকোয়ার্টারের ভেতর বড় খাঁচাটা নিয়ে গিয়ে তাতে রাখব। আরামেও থাকবে, নিরাপদও।'

'রেখো,' ফুটপাথ থেকে সাইকেল নামাল কিশোর।

খাওয়ার পর তাদের ব্যক্তিগত ওয়ার্কশপে চলে এল তিন গোয়েন্দা। প্রথমেই কবুতরের বড় খাঁচাটা হেডকোয়ার্টারে ঢোকানোর পালা। দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ঢুকবে না। কিন্তু অসুবিধে নেই। আরও অনেক গোপন পথ আছে। মোবাইল হোমের ছাতের স্কাইলাইটের ঢাকনা সরিয়ে সে-পথে ঢোকানো যাবে।

বড় খাঁচাটা নিয়ে জঞ্জালের ওপর দিয়ে উঠে গেল মুসা। অনেক দিন একভাবে পড়ে থেকে থেকে একটার সঙ্গে আরেকটা শক্ত হয়ে আটকে গেছে আলগা জঞ্জাল, মুসার ভারে নড়লও না। কিশোর আর রবিন কবুতর সহ ছোট খাঁচাটা নিয়ে দুই সুড়ঙ্গ দিয়ে ট্রেলারে ঢুকল। ছাতের ওপর থেকে স্কাইলাইটের ফোকর দিয়ে দড়িতে বেঁধে খাঁচা নামিয়ে দিল মুসা। নিজেও নেমে এল। ভেতর থেকেই আবার লাগিয়ে দিল ঢাকনা।

ছোট খাঁচা থেকে বড় খাঁচায় কবুতর সরানোয় ব্যস্ত হলো মুসা, রবিন তাকে সাহায্য করল। কিশোর এগোল ডেস্কের দিকে। মুখচোখ উজ্জ্বল। ঢুকেই তাকিয়েছে আগে যন্ত্রটার দিকে। সিগন্যাল লাইট জ্বলছে। তারমানে মেসেজ টেপ করেছে যন্ত্রটা।

ব্লিংকি, ভাবল কিশোর। ও-ই ফোন করেছিল। তাহলে সবুজ গাড়িওয়ালাই... ডেস্কে ঘুরে গিয়ে নিজের চেয়ারে বসল সে।

'শোনো, শোনো,' টেপটা চালু করে দিয়ে দুই সঙ্গীকে ডাকল সে।

ফিরে তাকাল মুসা আর রবিন।

'সাহায্য!' মহিলা কণ্ঠ। 'সাহায্য চাই। প্লীজ, সাহায্য করো আমাকে!' কেঁদে ফেলবেন যেন মিস কারমাইকেল। 'খুন! এই মাত্র দেখলাম ওর লাশ...' কান্নায় রুদ্ধ

হয়ে গেল কণ্ঠ। কয়েক মুহূর্ত ফোঁপানোর পর আবার শোনা গেল, 'হীরা! হীরাকে পিটিয়ে মেরেছে। আরও একটা লাশ পেয়েছি। আমার সুন্দর একটা বাজ পাখি। প্লীজ, সাহায্য করো আমাকে। আমার পাখিগুলোকে খুন করছে কেউ।'

# পাঁচ

'তোমাদের কার্ডটা পেয়ে মনে হলো হাতে চাঁদ পেয়েছি,' বললেন মিস কারমাইকেল। 'ওই মুহূর্তে তোমাদের মতই কারও কথা ভাবছিলাম। গোয়েন্দা।'

মেসেজ পাওয়ার পরই সাইকেল নিয়ে মিউজিক নেস্ট-এ চলে এসেছে তিন গোয়েন্দা। মিস কারমাইকেলের সাউণ্ডপ্রুফ ঘরে বসে কথা বলছে।

'পুলিশকে জানাইনি,' কাঁধে বসা তোতাটাকে আদর করলেন মিস কারমাইকেল। 'ইতিমধ্যেই বার কয়েক ঝামেলা করে গেছে। নালিশ জানিয়েছে, প্রতিবেশীরা নাকি আমার পাখিদের জ্বালায় অস্থির। ভেবেই পাই না, ওদের কি এমন জ্বালাচ্ছে পাখিগুলো।'

আমি আপনার প্রতিবেশী হলে নালিশ জানাতাম না, বহু আগেই তল্লাট ছেড়ে পালাতাম, মনে মনে বলল মুসা।

মহিলার কথা কিশোরের কানে ঢুকছে বলে মনে হলো না। গভীর মনোযোগে লাশ পরীক্ষা করছে। টেবিলে বিছানো সাদা কাপড়ের ওপর রাখা হয়েছে মৃত পাখি দুটোকে। দোয়েলের মাথা থেঁতলে দেয়া হয়েছে, বোধহয় লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরে। বাজটার গায়ে কোন ক্ষত নেই। বিষ খাইয়ে মেরেছে, মনে হয়।

'বাজটাকে কি খাওয়ান?' ফিরে জিজ্ঞেস করল কিশোর।

'মাংস,' বললেন মিস কারমাইকেল। 'জানো নিশ্চয়, ওরা মাংসাশী। সাংঘাতিক ধূর্ত শিকারী। ইঁদুর, খরগোশ, ছোট ছোট পাখি, যা পায় ধরে খায়। খাওয়ার জন্যেই শিকার করে তো, দোষ দিতে পারি না। তবু একেক সময় মনে হয় বড় বেশি নিষ্ঠুর ওরা।'

'নিষ্ঠুর!' প্রতিধ্বনি করল কাঁধে বসা তোতা, 'নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর!'

এই একটা শব্দই শিখেছে নাকি, ভাবল মুসা।

মাথা নেড়ে লাশ দুটো দেখিয়ে প্রশ্ন করল কিশোর, 'পেয়েছেন কোথায়, মানে, কোথায় পড়েছিল?'

'হীরা পড়ে ছিল লনের ধারে। বেচারাকে তোলার কথা ভাবছি, এই সময় চোখ পড়ল...' রুমাল বের করে চোখ মুছলেন মিস কারমাইকেল। 'দেখলাম, স্টীল পড়ে আছে গাছের তলায়।' ফুঁপিয়ে উঠলেন তিনি। কোনমতে বললেন, 'ওর খাওয়া...যেমন ছিল তেমনি পড়ে আছে। খায়নি। পাথর হয়ে ও পড়ে আছে গাছতলায়...আর কোন দিন উড়বে না...' শব্দ করে কেঁদে ফেললেন তিনি।

সহানুভূতি দেখিয়ে মাথা নাড়ল কিশোর। মহিলার উচ্ছ্বাস থামার সময় দিল। তারপর জিজ্ঞেস করল, 'জায়গাটা দেখাবেন?'

'নিশ্চই,' জানালা দিয়ে তাকালেন মিস কারমাইকেল। অন্ধকার হয়ে গেছে।

'দাঁড়াও, একটা টর্চ বের করি।'

'লাগবে না,' বলল কিশোর। 'আমাদের সাইকেলে লাইট আছে, খুলে নেব। চলুন।'

সূর্য ডোবার পর নীরব হয়ে গেছে পাখির দল। মিস কারমাইকেলের পেছনে আলো হাতে হাঁটছে তিন গোয়েন্দা। মাঝেসাঝে পেঁচার কর্কশ ডাক কানে আসছে। তার জবাবেই যেন অন্ধকার ডাল থেকে হেসে উঠছে কোন কাকাতুয়া, বুড়ো মানুষের খসখসে হাসির মত।

'ওই যে, ওখানে পড়েছিল হীরা,' ভাঙা গলায় বললেন মিস কারমাইকেল।

জায়গাটায় আলো ফেলল কিশোর। নিচু হয়ে একটা রক্তাক্ত পালক তুলল।

কেঁপে উঠলেন মিস কারমাইকেল। 'বাজপাখিটা পড়ে ছিল ওই গাছতলায়।...কিছু যদি মনে না করো, আমি যাই। একটু শোব। ভাল লাগছে না।'

বুকের ওপর দুই হাত আড়াআড়ি চেপে ধরে দ্রুত বাড়ির দিকে রওনা হলেন মিস কারমাইকেল।

মহিলার অবস্থা দেখে দুঃখই হলো কিশোরের, একই সঙ্গে দুই সন্তান মারা গেছে যেন তাঁর। তবে তিনি চলে যাওয়ায় খুশিও হয়েছে, কাজ করতে অস্বস্তি বোধ করছিল।

বাজটা যেখানে পড়েছিল সেখানে এসে দাঁড়াল কিশোর। একটা পালকও নেই। মাংসের টুকরোও না। বিষ খেয়েই যদি মারা গিয়ে থাকে বাজটা, হয় অন্য কোথাও থেকে খেয়ে এসেছে, কিংবা ওটার খাওয়া শেষ হওয়ার পর এসে সব কিছু পরিষ্কার করে দিয়ে গেছে যে খাইয়েছে।

আশেপাশের অনেকখানি জায়গায় ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে আলো ফেলে দেখল কিশোর। 'খুব খারাপ,' নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটা শুরু হলো তার।

'কি খারাপ?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'শক্ত মাটি,' এর চেয়ে বেশি কিছু বলার দরকার মনে করল না আপাতত কিশোর, সময়ও নেই, কাজ রয়েছে। 'রবিন, তুমি ওদিকের বনে ঢোকো। মুসা, তুমি এদিকে। মাঝের জায়গাটায় আমি ঢুকছি। ঠিক আছে?'

'তা আছে,' মাথা কাত করল মুসা। 'কিন্তু কিশোর, একটা কথা বলবে?'

'কি?'

'খুঁজছ কি তুমি?'

'পায়ের ছাপ,' আবার মাটিতে আলো ফেলল কিশোর। 'পড়েনি, বেশ শক্ত মাটি। তবে দিন দুই আগে বৃষ্টি হয়েছে, বনের কোথাও কোথাও নরম মাটি আছেই। ভিজে নরম হয়ে আছে। মিস কারমাইকেলের প্রতিবেশীদের কথা যা শুনলাম, মনে হয় না কেউ তার সঙ্গে আলাপ করতে আসে। তাই, যদি কারও পায়ের ছাপ পাওয়া যায়, ধরে নিতে হবে সেটা খুনীর।'

'চমৎকার,' অনেকটা টিটকারির সুরে বলল মুসা। 'যদি পেয়ে যাই, তো কি করবে? প্লাসটার কাস্ট করে ল্যাবোরেটরিতে পাঠাব?'

হতাশ ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর। 'এই সহজ কথাটাও বুঝছ না। ব্লিংকির

কথা ভুলে গেছ? ওর জুতো দেখোনি? কত বড়? তাছাড়া চোখা মাথা। এবার বুঝেছ?'

'চোখা হলে তো বুঝলাম ব্লিংকির,' কথা বলল রবিন, 'আর যদি তা না হয়? কি বুঝব?'

'সেটা তখন ভাবা যাবে।'

'ছাপ দেখতে পেলে কি করব?' মুসার প্রশ্ন।

'আলোর সঙ্কেত দেবে। জ্বালবে-নেভাবে জ্বালবে-নেভাবে, তিন বার করে, খানিক বিরতি দিয়ে আবার তিন বার। যতক্ষণ জবাব না পাবে, দিয়েই যাবে।'

তিনজন তিন দিকে রওনা হয়ে গেল।

সামান্য ঝুঁকে পা পা করে এগোচ্ছে কিশোর, বার বার লাইট ঘুরিয়ে দেখছে সামনে আর আশেপাশে। তার মনে হচ্ছে, মাঝের দিকটা বেছে নিয়ে ঠিক করেনি, এদিকে সুবিধে হবে না। ছাপ পাওয়ার আশা নেই। ঘন ঝোপঝাড়, নুড়ি আর বালিতে ঢাকা সরু পথ। এখানে পায়ের ছাপ বসবে না।

মুসা আর রবিনও নিশ্চয় কিছু দেখতে পায়নি, পেলে সঙ্কেত দিত। ফিরে যাবে কিনা ভাবছে কিশোর, এই সময় চোখে পড়ল ডানের ঝোপে কালোমত কি যেন। থমকে গেল সে।

স্থির দাঁড়িয়ে রইল এক মুহূর্ত। হঠাৎ করেই নড়ে উঠল, প্রায় দৌড়ে এসে বসে পড়ল ওটার কাছে।

অন্ধকারে কাছেই কোথাও কর্কশ চিৎকারে নীরবতা ভাঙল একটা পেঁচা। কিশোরের মনোযোগ ছিন্ন করতে পারল না বটে, কিন্তু পেছনে নড়াচড়ার শব্দটা ঢেকে দিল পাখির ডাক।

হালকা খসখস শব্দটা বড় বেশি দেরিতে কানে এল কিশোরের। গোড়ালিতে ভর করে বসা অবস্থায়ই পাঁই করে ঘুরল। সরে যাওয়ার চেষ্টা করল, পারল না, তবে মাথাটা বাঁচল। শক্ত লাঠির আঘাত কান ছুঁয়ে শিস কেটে এসে লাগল কাঁধে।

তীব্র বেদনার পর পরই মনে হলো অবশ হয়ে গেছে ডান হাত। আঙুলগুলো কোনমতে ধরে রইল লাইটটা। এক পাশে কাত হয়ে পড়ল সে, গড়ান দিয়েই চিত হলো, লাইটটা বুকের ওপর ধরে লেন্সটা ফেরাল কোণাকুণি ওপর দিকে।

কালো অয়েলস্কিন পরা একজন মানুষের মুখে পড়ল আলো।

মুখ না বলে বলা যায় দাড়ির জঙ্গল। নাক দেখা যাচ্ছে, ঠোঁট অস্পষ্ট। চোখ দুটোও এখন দেখা যায় না, কালো চশমায় ঢাকা।

চোখে আলো পড়ায় স্থির হয়ে গেল লোকটা, পরক্ষণেই ঘুরে এক দৌড়ে ঢুকে গেল পাশের ঘন জঙ্গলে। পিছু নেয়ার চেষ্টা করল না কিশোর। উঠে দাঁড়াল। শরীর কাঁপছে। বাঁ হাতে ডলতে শুরু করল কাঁধ। শুরু হলো তীব্র ব্যথা, অবশ ভাবটা কেটে যাচ্ছে ধীরে ধীরে। লাইটের লেন্স একটা বিশেষ দিকে ফিরিয়ে হাত দিয়ে ঢাকল, সরাল, আবার ঢাকল, আবার সরাল,পর পর তিনবার করল এরকম। সাড়া এল না। আবার একই রকম করল। থামল। আবার সঙ্কেত দিল।

সঙ্কেতের জবাব দিল মুসা। ছুটে আসতে শুরু করল।

'কিশোর?'

'এই যে, এখানে আমি।'

ঝোপের ওপাশ থেকে ঘুরে এসে দাঁড়াল মুসা। একটু পরেই উল্টো দিক থেকে এসে পৌঁছল রবিন।

কাঁধ ডলেই চলেছে কিশোর। ব্যথা একটু কমছে মনে হচ্ছে।

কি হয়েছে, কিশোর?' উদ্বিগ্ন হয়ে প্রশ্ন করল রবিন।

'রিচার্ড হ্যারিস,' বলল কিশোর। 'ব্যাটা আমাকে লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরেছে। কপাল ভাল মাথায় লাগেনি, তাহলে গেছিলাম। মুখে আলো পড়তেই চমকে গেল, ছুটে পালাল। ওই যে ওদিকে,' হাত তুলে দেখাল। 'কোন শব্দ শোনোনি? দেখেছ ওকে?'

'নাহ্। ঝোপঝাড় খুব বেশি। আর গেটের দিকে গিয়ে থাকলে আমার কাছ দিয়ে যাওয়ার কথা না।'

'পিছু নেব নাকি?' বলল বটে মুসা, কিন্তু অন্ধকারে একটা বাজে লোককে অনুসরণের কথা ভাবতেই জানি কেমন লাগছে, তাছাড়া লোকটার হাতে রয়েছে মোটা লাঠি, অন্যের মাথায় বাড়ি মারার প্রবণতাও আছে।

'না,' মুসার মত একই কথা ভাবছে কিশোরও। 'একটা কিছু আছে এখানে, ও-ব্যাটার জন্যে দেখতে পারিনি ভালমত।' আলো ফেলল ঝোপের কিনারে। কালোমত বস্তুটার কাছে এসে বসল আবার, তার পাশে বসল রবিন আর মুসা।

'খাইছে!' মুসা চেঁচিয়ে উঠল 'এ-যে দেখছি, এ-যে দেখছি...'

'হ্যাঁ,' বলল কিশোর, 'ঠিকই দেখছ। মরা কবুতর।'

কবুতর না বলে বলা উচিত কবুতরের অবশিষ্ট। মাথাসহ শরীরের ওপরের অংশ নেই, টেনে ছিঁড়ে ফেলা হয়েছে, বাকি রয়েছে লেজের কাছের অতি সামান্য চামড়া আর মাংস, পালকগুলো গেঁথে রয়েছে তাতে। একটা ডানার খানিকটা আর পা দুটোও আছে।

হাত বাড়িয়ে একটা পা তুলে নিল কিশোর। গোড়ালিতে অ্যালুমিনিয়মের পাতলা আংটা পরানো। নিজের লাইট মাটিতে রেখে রবিনের লাইটের আলোয় পা থেকে জিনিসটা খুলল সে, পাতলা মোড়কের ভেতর ছোট একটা ভাঁজ করা কাগজ। সাবধানে মোড়কের জোড়া ছুটিয়ে সোজা করল, ভেতরের কাগজ বের করে মেলল। সমান করল হাত দিয়ে ডলে।

বকের মত গলা বাড়িয়ে দুপাশ থেকে কাগজটার ওপর ঝুঁকে এল অন্য দুজন।

'হায় হায়, এটা কি ভাষা?' বলে উঠল মুসা। 'চীনা নাকি?'

ছাপার অক্ষর হলে হয়তো বোঝা যেত, কিন্তু হাতে লেখা, তাই প্রথমে রবিনও চিনতে পারল না। 'চীনাই বোধহয়,' বিড়বিড় করল সে। 'না না, জাপানী পাঠকও আছে, বই নিতে আসে। চিনি কয়েকজনকে।'

চিন্তিত ভঙ্গিতে মাথা নাড়ল কিশোর, কাগজটা যত্ন করে রেখে দিল পকেটে। তারপর ঝুঁকে আবার দেখতে লাগল কবুতরের দেহাবশেষগুলো।

'দেখো দেখো,' উত্তেজিত কণ্ঠে বলল সে, 'বাঁ পা-টা দেখো!'

মুসা আর রবিনও দেখল।

যে-ই মেরেছে পাখিটাকে, কোন কারণে পা-দুটো নষ্ট করেনি, নিচের অংশ অক্ষত রয়েছে। বাঁ পায়ে তিনটের জায়গায় রয়েছে দুটো আঙুল।

# ছয়

'আজ মুক্তো নেই,' সাইকেল চালাতে চালাতে আনমনে বিড়বিড় করল কিশোর। তার পাশে পাশে চলেছে রবিন আর মুসা।

সকাল বেলায়ই বেরিয়ে পড়েছিল ওরা। রবিনের পরিচিত একজন জাপানী ভদ্রলোকের বাড়ি গিয়েছিল। লাইব্রেরিতে বই নিতে আসেন তিনি প্রায়ই। তাঁকে দিয়ে মেসেজটা পড়িয়েছে, মর্মোদ্ধার করেছে। তিনটে শব্দ শুধু লেখা ঃ আজ মুক্তো নেই।

ভাবনার ঝড় বইছে গোয়েন্দাপ্রধানের মাথায়। মুক্তো। কবুতর। মৃত দোয়েল। মৃত বাজ পাখি। আর রিচার্ড হ্যারিস।

স্যালভিজ ইয়ার্ডে পৌঁছে দেখা গেল, উত্তেজিত হয়ে আছেন মেরিচাচী। ভারি ভারি অনেক মালপত্র নিয়ে এসেছেন রাশেদ চাচা। সেগুলো গোছাতে হিমশিম খেয়ে যাচ্ছে ইয়ার্ডের দুই বিশালদেহী কর্মচারী, দুই ব্যাভারিয়ান ভাই, বোরিস ও রোভার।

তিন কিশোরকে দেখে এগিয়ে এলেন মেরিচাচী। 'এই যে, তোরা এসেছিস। ভালই হয়েছে। তোর চাচার কাণ্ড দেখ কিশোর, কি সব নিয়ে এসেছে। বাঁকাচোরা এসব লোহার পাইপ দিয়ে হবেটা কি? বিক্রি হবে ওজন দরে ছাড়া? আর তাতে লাভ তো কিছু হবেই না, লোকসান যাবে প্রচুর।'

'ভেব না চাচী, লোকসান যাবে না,' আশ্বাস দিল কিশোর। 'কোন একটা উপায় হয়ে যাবেই।'

অফিসের বাইরে ছায়ায় বসে পাইপ টানছিলেন রাশেদ পাশা, মুখ থেকে সরিয়ে খুকখুক করে কাশলেন, মস্ত গোঁফের ডগায় আলতো মোচড় দিয়ে উঠে এলেন। 'বোঝা তুই, কিশোর, আমি তো পারলাম না। তখন থেকে চেঁচামেচি করছে।'

'কি করে বিক্রি হবে শুনি?' কোমরে দু-হাত রেখে দাঁড়ালেন মেরিচাচী।

'হবে হবে,' আবার পাইপ মুখে দিলেন রাশেদ পাশা, কিশোরের দিকে তাকালেন, ইচ্ছে, বুদ্ধিটা বাতলে দিক কিশোর।

'হবে হবে তো বলছই শুধু, কি করে হবে?'

'এই কিশোর, বলে দে না,' ভাতিজার ওপর গভীর আস্থা রাশেদ চাচার, তাঁর স্থির বিশ্বাস আইনস্টাইন কিংবা নিউটনের চেয়ে কোন অংশে কম যায় না কিশোর, একটা উপায় বের করে ফেলবেই।

'চাচী, তুমি খামোকা ভাবছ। বাজারে পাইপের যা দাম এখন,' বলল কিশোর, 'ডবল দামে বিক্রি করতে পারব। গত বছর পাইপ ঢালাইয়ের একটা বাতিল মেশিন এনেছিল না চাচা, যেটা পড়ে আছে এখনও, সেটা মেরামত করে নেব। তারপর

জন্য দুই ঢালাই মিস্ত্রিকে ভাড়া করে নিয়ে এলেই হবে। এক ঢিলে দুই পাখি মারা হয়ে যাবে। মেশিনটাও বিক্রি হবে, পাইপগুলোও ডবল দর…'

'হোহ্ হোহ্ হো,' মুখ থেকে পাইপ খসে পড়ল রাশেদ পাশার, তোলার চেষ্টা করলেন না, হাততালি দিয়ে লাফিয়ে উঠলেন বাচ্চা ছেলের মত। 'মেরি বেগম, এবার কি বলবে?' আঞ্চলিক বাংলায় টেনে টেনে বললেন, 'কইছিলাম না, আমাগো কিশোর থাকতে কোন চিন্তা নাই। অই মিয়ারা, খাড়ায়া খাড়ায়া কি দেখতাছো, তোলো তোলো, তুইল্লা রাখো পাইপগুলান।' শেষ কথাগুলো দুই ব্যাভারিয়ান ভাইয়ের উদ্দেশ্যে বললেন, কিন্তু কিছুই বুঝল না ওরা, হাঁ করে চেয়ে আছে রাশেদ প্যাশার মুখের দিকে।

হাসি ছড়িয়ে পড়েছে মেরিচাচীর সারা মুখে। 'কিশোর, আজ তোদের আমি ফ্রুট কেক খাওয়াব।'

'কেক না চাচী, আইসক্রীম…'

'দুটোই বানাতে যাচ্ছি,' হেলেদুলে আনন্দে প্রায় নাচতে নাচতে বাড়ির দিকে রওনা হলেন মেরিচাচী।

পুরো দুই ঘণ্টা লাগল পাইপগুলো গোছগাছ করতে। কাজ শেষ করে হাতমুখ ধুয়ে, খেয়ে, ওয়ার্কশপে চলে এল তিন গোয়েন্দা।

দুই সুড়ঙ্গের মুখের ধাতব পাত সরিয়ে প্রথমে ঢুকল কিশোর, তার পেছনে রবিন, সব শেষে মুসা।

পাইপের অন্য মুখের ঢাকনা সরিয়ে ট্রেলারের ভেতরে উঁকি দিল কিশোর। প্রথমেই তাকাল জবাব-দেওয়া মেশিনটার দিকে। আলো জ্বলছে না, তারমানে কোন ফোন আসেনি। হতাশ হলো। উঠে এসে বসল নিজের চেয়ারে।

পুরানো একটা রকিং চেয়ারে বসে ফাইলিং কেবিনেটের ড্রয়ারে পা তুলে দিল মুসা। রবিন বসল একটা টুলে, দেয়ালে পিঠ ঠেকিয়ে।

চিরাচরিত নিয়মে আলোচনার সূত্রপাত করল কিশোর। 'মুক্তা। এই কেসের প্রধান রহস্য।'

'কবুতরও,' খাঁচার ভেতরে বসা পায়রাটাকে দেখিয়ে বলল মুসা। 'দু-আঙুলে কবুতর, তিন আঙুলে কবুতর, জ্যান্ত কবুতর, মরা কবুতর।'

'মুক্তো,' আবার বলল কিশোর। 'মেসেজ লেখা ঃ আজ মুক্তো নেই। মিস কোরিন কারমাইকেলের মুক্তোপ্রীতি। তাঁর একটা দোয়েল ছিল, যেটা মুক্তো এনে দিত।'

'হীরা,' মাথা ঝোঁকাল রবিন, নোট বই বের করছে পকেট থেকে। 'ঠোঁটে করে মুক্তো নিয়ে এল। মিস কারমাইকেল বললেন ঃ এই নিয়ে তিনটে হলো।'

'তারপর কেউ খুন করল হীরাকে,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলে চলল কিশোর। 'হতে পারে রিচার্ড হ্যারিস। তার গহনার দোকান আছে, মুক্তো বিক্রি করে। এই রহস্যের প্রধান বিষয়বস্তু যদি মুক্তো হয়…' মাঝে মাঝে দুর্বোধ করে কথা বলা তার স্বভাব, আসলে মনে মনে না ভেবে জোরে জোরে ভাবে সে তখন, তাই এমন মনে হয় কথাগুলো, 'মুক্তোই যদি আসল কথা হয়, তাহলে এর মাঝে কবুতর আসছে কি

করে? কবুতর ডিম পাড়ে, মুক্তো পাড়ে না। যোগাযোগটা কোথায়?'

'হয়তো পাড়ে। সোনার ডিম-পাড়া রাজহাঁসের কিচ্ছা পড়নি···' বাধা পেয়ে থেমে গেল মুসা।

ফোন বেজে উঠেছে।

লাইনের সঙ্গে যুক্ত স্পীকারের সুইচ অন করে দিয়ে রিসিভার তুলে নিল কিশোর। 'হ্যালো তিন গোয়েন্দা।'

'হ্যালো, কিশোর পাশা?' পরিচিত কণ্ঠ, উদ্বিগ্ন। 'কিশোরকে চাই।'

'বলছি।'

'কিশোর,' এক মুহূর্ত নীরবতা, থমকে গেছে বোধহয় লোকটা, কিংবা দ্বিধা করছে, 'আমাকে চিনতে পারছ? আমি, আমি, ওই যে দুই দিন আগে রেস্টুরেন্টে দেখা হয়েছিল। ভুলে বাক্সটা ফেলে গেছিলাম। পরে ফিরে গিয়ে ওয়েইট্রেসকে জিজ্ঞেস করে জানলাম, তোমরা নিয়ে গেছ। নানা ঝামেলায় আর খোঁজ নিতে পারিনি।'

মাউথ পীসে হাত চাপা দিল কিশোর, ফিসফিস করে উত্তেজিত গলায় বলল, 'স্লিংকি।'

'হ্যালো?' নার্ভাস মনে হচ্ছে ওপাশের লোকটাকে। 'হ্যালো। শুনছ?'

'শুনছি, বলুন,' জবাব দিল কিশোর। 'বাক্সটা নিয়ে এসেছি আমরা, ঠিকই বলেছে ওয়েইট্রেস।'

দীর্ঘ আরেক মুহূর্ত নীরবতা।

'হ্যালো, আছে তো এখন তোমাদের কাছে? আমার বাক্সটা?'

'আছে। চারকোণা বাক্স, চীজক্লথে মোড়া, সে-ভাবেই আছে। আপনি ফেলে গেছেন দেখে নিয়ে এসেছিলাম, জানি ফোন করবেনই।'

'খুব ভাল করেছ,' স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল স্লেটার। 'তোমাদের একটা পুরস্কার পাওনা হয়েছে। বাক্সটা যদি নিয়ে আসো, পঞ্চাশ ডলার পাবে।'

'থ্যাংক ইউ। কোথায় আনব?'

'আমি জানি তুমি কোথায় থাকো···মানে অনুমান করেছি আরকি। রকি বীচ, না? তাহলে ট্রাসটি ব্যাঙ্কের পারকিং লটে সুবিধে বেশি।'

'ঠিক আছে। কখন আসব?'

'আজ রাত নটার দিকে?'

'ঠিক আছে।'

'তাহলে রাত ন'টায় দেখা হচ্ছে,' আবার নার্ভাস হয়ে পড়েছে লোকটা, কণ্ঠস্বরে সেটা স্পষ্ট।

লাইন কেটে গেল।

রিসিভার নামিয়ে রাখল কিশোর।

'খাইছে,' বলে উঠল মুসা, 'একটা কবুতরের জন্যে পঞ্চাশ ডলার!'

জবাব দিল না কিশোর। জোরে জোরে চিমটি কাটছে নিচের ঠোঁটে, গভীর ভাবনায় মগ্ন।

'চীজক্লথটা রেখে দিয়েছি,' বলতে বলতে ফাইলিং কেবিনেট খুলল রবিন। 'টমকে ছোট খাঁচায় ভরে আবার মোড়াবে?'

পুরো এক মিনিট কোন কথা বলল না কিশোর, তারপর মাথা নাড়ল।

'ব্লিংকির কথাগুলো পর্যালোচনা করে দেখি আগে,' জোরে জোরে ভাবতে শুরু করল সে, বলল, 'আমি জানি তুমি কোথায় থাকো···তারপর শুধরে নিয়ে বলল, মানে অনুমান করেছি আরকি। রকি বীচ, না? এটা জানা আর অনুমানের মধ্যে তফাতটা কোথায়? আমাদের কার্ডে তো রয়েছে ফোন নম্বর, ঠিকানা জেনে নেয়াটা কোন ব্যাপারই না। দ্বিধা করেছে, তারমানে মিথ্যে কথা বলেছে, খুব ভালমতই জানত আমরা কোথায় থাকি, অনুমান-টনুমান কিচ্ছু না।'

'তাহলে সে-ই কবুতর বদল করেছে,' বলল রবিন।

'তাই তো মনে হয়। আমি মিছে কথা বলেছি, জানে সে। কিন্তু চেপে গেছে। আবার চীজক্লথে মুড়ে যদি খাঁচাটা নিয়ে যাই, হাতে নিয়ে বলবে "থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ···" '

'এবং পঞ্চাশ ডলার দেবে,' মনে করিয়ে দিল মুসা।

'এবং ভাব দেখাবে, খাঁচার ভেতরে আগের কবুতরটাই আছে, সেভাবেই নিয়ে চলে যাবে। তারপর আর কোন দিন তার দেখা পাব না আমরা। এই কেসের মহামূল্যবান একটি মাত্র সূত্রও হাতছাড়া হয়ে যাবে।'

'কি করতে বলো তাহলে?' জিজ্ঞেস করল রবিন।

'চূড়ান্ত কিছু একটা করতে হবে। না মুড়েই খাঁচা নিয়ে তার সামনে হাজির হব, তাকে আমাদের কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দিতে বাধ্য করব। তোমার কি মনে হয় মুসা?'

মাথা চুলকাল সহকারী-গোয়েন্দা। ঠিক আছে, যা ভাল বোঝো। পঞ্চাশ ডলার হারাতে রাজি নই আমি। মেলা টাকা। তবে একটা কথা ঠিকই বলেছ, এই রহস্যের সমাধান করতে চাইলে ব্লিংকির মুখ খুলতে হবে আমাদের।'

আরও কিছুক্ষণ আলাপ-আলোচনার পর বাড়ি রওনা হলো মুসা আর রবিন। সেই সকালে বাড়ি থেকে বেরিয়েছে, মা-বাবা নিশ্চয় দুশ্চিন্তা করছেন, রাতে আবার বেরোনোর আগে তাদের সঙ্গে অন্তত একবার দেখা করে আসা দরকার। ইয়ার্ডে আর ফিরবে না। ট্রাসটি ব্যাংকে পারকিংলটে চলে যাবে যার যার মত, নটার মিনিট দশেক আগে মিলিত হবে ওখানে।

সাড়ে আটটায় টমকে ছোট খাঁচায় ভরে সাইকেলের ক্যারিয়ারে খাঁচাটা বেঁধে নিল কিশোর। শহরের দিকে রওনা হলো।

ব্যাংকটা মেইন স্ট্রীটে, হ্যারিসের দোকান থেকে দূরে নয়। বিশাল সাদা বাড়িটার পেছনে পার্কিংলটে সাইকেল নিয়ে ঢুকে পড়ল কিশোর। ব্যাংক বন্ধ হয়ে গেছে, অল্প কয়েকটা গাড়ি আছে এখন লটে। পারকিঙের জায়গাটাকে তিন দিক থেকে ঘিরে রেখেছে বিল্ডিং। আধো অন্ধকার সেখানে।

দেয়াল ঘেঁষে সাইকেলটা রেখে আলো নিভিয়ে দিল কিশোর, ক্যারিয়ার থেকে খুলে নিল খাঁচা।

চারপাশে তাকাল। অন্ধকারে ছড়িয়ে ছিটিয়ে রয়েছে ছয়-সাতটা গাড়ি। কোনটাতেই প্রাণের সাড়া নেই।

ঘড়ি দেখল কিশোর। পৌনে নটা। আর পনেরো মিনিট পরে ব্রিংকির আসার কথা। মুসা আর রবিন আসতে আর পাঁচ মিনিট। পার্কিংলটের প্রবেশ মুখে ওদের অপেক্ষায় থাকার সিদ্ধান্ত নিল সে। ওখানে আলো আছে যথেষ্ট, রাস্তার লাইটের আলো। পা বাড়াল।

'এই ছেলে, থামো,' পেছনের অন্ধকার ছায়া থেকে বলে উঠল কেউ।

যা বলা হলো করল কিশোর। যেখানে ছিল সেখানেই অনড় হয়ে গেল, খাঁচাটা দু-হাতে পেটের সঙ্গে শক্ত করে চেপে ধরেছে।

'আস্তে করে ঘোরো,' আবার আদেশ হলো।

যতখানি আস্তে পারল ঘুরল কিশোর।

বিষণ্ণ ছায়া থেকে বেরিয়ে এল লোকটা। সামনের দিকে বাড়িয়ে দিয়েছে ডান হাত। কিছু একটা ধরে রেখেছে। আধো অন্ধকারেও চমকাচ্ছে জিনিসটা।

আগ্নেয়াস্ত্রের ধাতব নল চিনতে কোন অসুবিধে হলো না কিশোরের। চোখ সরাতে পারল না ওটার ওপর থেকে।

'খাঁচাটা রাখো তোমার সামনে, মাটিতে,' আদেশ দিল লোকটা।

ঝুঁকে রাখল কিশোর।

আরেকটু কাছে এল লোকটা। কিশোরের দিক থেকে নল না সরিয়েই উবু হলো, পরীক্ষা করে নিশ্চিত হলো কবুতরটা রয়েছে খাঁচার ভেতরে।

'গুড।'

সোজা হলো লোকটা। চকিতের জন্যে তার চেহারা স্পষ্ট দেখতে পেল কিশোর। উজ্জ্বল কালো অয়েলস্কিন পরনে, চোখে কালো চশমা, মুখ ঢেকে আছে দাড়িগোঁফ। রিচার্ড হ্যারিস।

'ঘোরো,' বলল লোকটা। 'উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ো মাটিতে।'

লোকটার কণ্ঠস্বর অবাক করল কিশোরকে। নিচু পর্দা, কথা বলতে খুব কষ্ট হচ্ছে, যেন জোর করে বলছে। আমার চেয়ে কম ভয় পাচ্ছে না ব্যাটা—ভাবল কিশোর, এবং সেটা লুকাতে চাইছে।

শাসানোর ভঙ্গিতে নল নাড়ল লোকটা।

আর দ্বিধা করল না কিশোর, যা বলা হলো, করল। শুয়ে পড়ল।

'দুই হাত পেছনে, পিঠের ওপর তুলে আনো।'

তুলল কিশোর। কানে এল ছেঁড়ার শব্দ, টেনে কাপড় ছেঁড়া হচ্ছে…নাকি, রোল থেকে অ্যাডেসিভ টেপ হ্যাঁচকা টান দিয়ে ছাড়াচ্ছে? মুহূর্ত পরেই বুঝল, কি জিনিস। টেপ দিয়ে পেঁচিয়ে পেঁচিয়ে বাঁধা হলো তার হাত, দড়ি কিংবা কাপড়ের ফালির চেয়ে অনেক শক্ত বাঁধন।

নড়ল না কিশোর। চকমকে নলের চেহারাটা মনের পর্দায় উজ্জ্বল। চুপচাপ শুয়ে অনুভব করল, পা-ও বাঁধা হচ্ছে।

শুনল, চলে যাচ্ছে লোকটার পদশব্দ। পেছনে কোথাও গুঞ্জন তুলল গাড়ির

এঞ্জিন, হেড লাইট জ্বলল। হাত-পা এমনভাবে বাঁধা, মাথা তুলতেও অসুবিধে হচ্ছে। তবু যতখানি পারল তুলল, সাবধানে, ঘুরে তাকাল।

চলতে শুরু করেছে গাড়ি। অন্ধকারে দেখা যাচ্ছে না গাড়ির বডি, চেনা না অচেনা বোঝা যাচ্ছে না। বিশ গজ দূর দিয়ে চলে গেল গাড়ি, টায়ারের কর্কশ শব্দ তুলে মোড় নিয়ে নামল রাস্তায়, অদৃশ্য হয়ে গেল।

শুয়ে শুয়ে নিজেকে দোষারোপ করছে কিশোর। পারকিংলটে ঢোকার আগে মুসা আর রবিনের জন্যে অপেক্ষা করা উচিত ছিল। অন্ধকারে বোকার মত ঢুকে পড়েছে একা একা, লোকটাকে সুযোগ দিয়েছে···

গেটের দিক থেকে পায়ের শব্দ এগিয়ে আসছে। সাইকেলের লাইট দেখা গেল।

'মুসা,' ডাকল কিশোর। 'রবিন।'

দুপাশ থেকে কিশোরের ওপর ঝুঁকে বসল দুই সহকারী গোয়েন্দা। কব্জি আর গোড়ালি থেকে টেপ তুলতে শুরু করল। চড়চড় করে রোম ছিঁড়ে নিয়ে উঠে আসছে টেপ, জ্বালা করছে চামড়ায়।

আহত জায়গা ডলতে ডলতে জানাল কিশোর কি ঘটেছে।

নরম শিস দিয়ে উঠল মুসা, 'পিস্তল?'

'তাই তো মনে হলো,' উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'গুলি ভরা ছিল কিনা জিজ্ঞেস করিনি, যদি আমার ওপরই প্রমাণ করে দেখাতে চায়।' প্যান্টের ধুলো ঝাড়তে ঝাড়তে বলল, 'তোমরা কিছু দেখেছ?'

মাথা ঝোকাল রবিন। 'গাড়ি দেখলাম একটা, কালো। ব্লিংকিরটার মতই মনে হলো। লাইসেন্স প্লেটে দেখলাম এম ও কে লেখা। ঠিক···'

'ব্লিংকির গাড়ির প্লেটে যে রকম লেখা ছিল,' বলল কিশোর। 'যেটাতে করে "স্ন্যাকস" রেস্টুরেন্টে গিয়েছিল। যেটা···' নিশ্চিত নয়, তাই বাক্যটা শেষ করল না সে। রিচার্ড হ্যারিসের অলঙ্কারের দোকান থেকে বেরিয়ে সেদিন যে গাড়িটা দেখেছে সেটার কথাই বলতে যাচ্ছিল। লাইসেন্স প্লেটের নাম্বার পুরোটা পড়তে পারেনি, তবে শুরুতে এম লেখাটা দেখেছে বলে মনে পড়ছে।

'তো, এখন কি করা?' মুসা বলল। 'টমকে নিয়ে গেছে হ্যারিস, ব্লিংকি···'

'হ্যাঁ,' মুসার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল রবিন, 'ব্লিংকি এলে তাকে কি জবাব দেব?'

ঘড়ি দেখল কিশোর। নটা বাজতে দুই মিনিট বাকি। 'কিছুই না, কারণ তার জন্যে আর অপেক্ষাই করছি না আমরা। চলো কেটে পড়ি। যার যার বাড়ি চলে যাব। সকালে হেডকোয়ার্টারে আলোচনা হবে।'

সাইকেল নিয়ে তাড়াতাড়ি পারকিংলট থেকে বেরিয়ে এল তিন গোয়েন্দা। সে রাতে ভাল ঘুম হলো না কিশোরের। মনে ভাবনার বোঝা। টমকে হারিয়েছে ওরা, চূড়ান্ত কিছু একটা করা সম্ভব হয়নি ব্লিংকির সঙ্গে, তাকে প্রশ্ন করা যায়নি। মিস কারমাইকেলকে বলার কিছু নেই। তাঁকে গিয়ে বলা যাবে না, তাঁর বন্ধু রিচার্ড হ্যারিস পাখিগুলোকে খুন করেছে। প্রমাণ করতে পারবে না সেটা। যদি মিস

কারমাইকেল জিজ্ঞেস করেন, সাধারণ দুটো পাখিকে খুন করে রিচার্ডের কি লাভ, জবাব দিতে পারবে না কিশোর। জবাব তার নিজেরই জানা নেই। আর সত্যি কি রিচার্ডই খুন করেছে পাখিগুলোকে?'

এবারের কেসটায় বিশেষ সুবিধে করতে পারছে না তিন গোয়েন্দা। সূত্র একটা যা-ও ছিল হাতে, তা-ও খুইয়ে এসেছে। এখন একমাত্র ভরসা ব্লিংকি, যদি সকালে ফোন করে কৈফিয়ত চায়। অর্থাৎ যদি সে যোগাযোগ করে। তাহলে তাকে কয়েকটা প্রশ্ন করা যেতে পারে, যদিও ফোন করার সম্ভাবনাটা খুবই ক্ষীণ।

পারকিংলটে অপেক্ষা করাই বোধহয় উচিত ছিল, চলে এসে ভুল করলাম না তো? মনে একগাদা প্রশ্ন নিয়ে ঘুম ভাঙল কিশোরের। যতগুলো প্রশ্ন মনে নিয়ে ঘুমিয়েছিল, একটারও জবাব মেলেনি।

ইদানীং তার হয়েছে আরেক বিপদ, মেরিচাচীর হঠাৎ করেই খেয়াল হয়েছে, আজকাল খাওয়ার প্রতি কিশোরের বিশেষ আগ্রহ নেই। ফলে সকালে উঠেই গাদা গাদা গিলতে হয়। মেরিচাচী সামনে বসে থাকেন, ফাঁকি দেয়ার উপায় নেই। কিশোরের ধারণা, এতে তার চিন্তাশক্তি ব্যাহত হচ্ছে।

ঘুম থেকে উঠেই দেখল কিশোর, নাস্তা রেডি। টেবিলে বসে কাগজ পড়ছেন চাচী, কিশোরকে দেখেই কাগজটা সরিয়ে রেখে প্লেট চামচ টানাটানি শুরু করলেন।

ডিম, মাংস, মাখন, পনির, রুটি, আপেল আর দুই গ্লাস দুধ খাওয়ার পর মনে হলো কিশোরের, আগামী এক বছর আর কিচ্ছু খাওয়ার দরকার হবে না। এরপরও যখন কয়েকটা আঙুল মুখে দেয়ার জন্যে চাপাচাপি শুরু করলেন চাচী, রেগে গেল কিশোর। মুখের ওপর বলে দিল, যদি এ-রকম করে, তাহলে সোজা গিয়ে শুয়ে পড়বে বিছানায়, বাঁকাচোরা পাইপের ব্যাপারে কোন সহযোগিতা করবে না। এত ভারি পেট নিয়ে না নড়তে পারে মানুষ, না কাজ করতে পারে?

'ঠিক আছে ঠিক আছে,' তাড়াতাড়ি হাত তুলে বললেন চাচী, 'এখন থাক। ঘন্টাখানেক পরেই খাস।'

গটমট করে বাইরে বেরিয়ে এল কিশোর। সোজা রওনা হলো ওয়ার্কশপে। ঢুকেই থমকে গেল। একটা বাক্সের ওপর বেশ আরাম করে বসে আছে পাখিটা। তাকে দেখেই চোখ ফিরিয়ে তাকাল।

কাছে গিয়ে পাখিটাকে তুলে নিল কিশোর। ডানা আর লেজের চকচকে পালকগুলো দেখল। না, কোন ভুল নেই। সাদা ফুটকিগুলো অবিকল এক। তাছাড়া পাখিটাও চিনতে পেরেছে তাকে, নইলে ধরা দিত না।

টম। ফিরে এসেছে।

# সাত

'টমই,' মুসা বলল, 'কোন সন্দেহ নেই। এই যে লেজের সাদা ফুটকি, কয়েক বছর পর দেখলেও ঠিক চিনতে পারতাম। আমাদেরকেও চিনতে পেরেছে। পারিসনি, টম?'

হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা। আবার আগের জায়গায়, বড়-খাঁচায় ফিরে গেছে টম। দানা ঠুকরে খাচ্ছে, মাঝে মাঝে চোখ ফিরিয়ে তাকাচ্ছে এদিকে।

'রিচার্ড হ্যারিস ছিনিয়ে নিল ওকে আমার কাছ থেকে,' নিচের ঠোঁটে জোরে জোরে চিমটি কাটছে কিশোর, কাউকে উদ্দেশ্য করে বলল না কথাগুলো। 'কয়েক ঘণ্টা পর ছেড়ে দিল কবুতরটাকে, ফিরে এল ওটা আবার আমাদের কাছে। কেন?'

'আমাদের কাছে ফিরে আসবে হয়তো ভাবেনি হ্যারিস,' বলল রবিন।

'মানে?' ভুরু কোঁচকাল মুসা।

'বইতে পড়লাম,' দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় মেসেজ বহন করত রেসিং হোমার। মিলিটারি যখন অ্যাডভান্স করত, কবুতরগুলোকে খাঁচাশুদ্ধ বয়ে নিত, নতুন জায়গায় আটকে রাখত কয়েকদিন, তারপর ছাড়ত। সঙ্গে সঙ্গে ছাড়লে আগের জায়গায় ফিরে যেত পাখিগুলো। এই কবুতরের স্বভাব হলো, পুরানো আশ্রয়ের কথা তাড়াতাড়ি ভুলে যায়, দু-তিন দিন অন্য কোথাও থাকলে সেটার কথাই মনে রাখে। সেখান থেকে সরিয়ে আরেক জায়গায় নিয়ে দু-তিন দিন রাখলে, এর আগেরটার কথা আবার ভুলে যায়। হয় ভোলে, কিংবা যেতে চায় না, যেটাই হোক···'

'হুঁ, এজন্যেই তাহলে ফিরে এসেছে টম,' মাথা দোলাল কিশোর। 'বলে ভালই করেছ, রবিন। পাখিটার মালিক বোধহয় রিচার্ড হ্যারিস নয়। আমাদের কাছ থেকে নিয়ে গিয়ে ছেড়ে দিয়েছে। তার ধারণা ছিল, বাড়ি ফিরে যাবে টম। তা না গিয়ে চলে এসেছে এখানে, স্বভাবের কারণে।'

'এটাই এখন তোর বাড়ি, না টম?' খাঁচার ফাঁক দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে পায়রাটার মাথায় ছোঁয়াল মুসা, আদর করল। 'তাই ফিরে এসেছিস। খুব খুশি হয়েছি···'

কথায় বাধা পড়ল। লাউডস্পীকারে বেজে উঠল মেরিচাচীর কণ্ঠ। 'কিশোর। কিশোর।'

কিশোরের এটা আরেকটা নতুন সংযোজন। ওরা হেডকোয়ার্টারে থাকলে দরকার পড়লে ডাকেন চাচী। অনেক কারণে সব সময় সে ডাক স্কাইলাইটের ভেতর দিয়ে শোনা যায় না। তাই ওয়ার্কশপে একটা মাইক্রোফোন লাগিয়ে দিয়েছে সে, হেডকোয়ার্টারে স্পীকারের সঙ্গে যোগ করে দিয়েছে।

'এই কিশোর, শুনছিস?' আবার ডাক শোনা গেল।

ডাকের ধরন বিশেষ সুবিধের মনে হলো না মুসার কাছে। বলেই ফেলল, 'আল্লাহরে! কি জানি নিয়ে এসেছে রাশেদ-চাচা! এবার হয়তো বেঁকাবুঁকা ইলেকট্রিকের খাম্বা, দেড় টন করে ওজন একেকটার···' বলতে বলতে দুই সুড়ঙ্গের ঢাকনার দিকে এগোল সে।

'ওদিকে না,' বাধা দিল কিশোর। 'স্কাইলাইট দিয়ে বেরিয়ে ওয়ার্কশপের পেছনে গিয়ে নামব,' মিটিমিটি হাসছে সে।

জঞ্জালের ওপর দিয়ে নেমে এল ওরা। মেরিচাচী ওদের দিকে পেছন করে দাঁড়িয়ে আছেন ওয়ার্কশপে।

আস্তে গিয়ে চাচীর কাঁধে হাত রাখল কিশোর।

চমকে উঠলেন চাচী। ফিরে তাকালেন। 'এই দেখো শয়তান ছেলের কাণ্ড। এই বেরোলি কোত্থেকে তোরা? ওদিকে তো সব জায়গা খুঁজে এলাম...'

'জঞ্জালেতে বাসা আমার, আকাশ দিয়ে পথ,' হেঁড়ে গলায় গান ধরল কিশোর, 'বলো শুনি,লক্ষ্মী চাচী, তোমার কি বিপদ?'

অবাক হয়ে কিশোরের দিকে চেয়ে রইলেন চাচী। চোখে শঙ্কা, ছেলেটার মাথা-টাথা খারাপ হয়ে যায়নি তো!'

'ভয় নেই, চাচী,' হেসে আশ্বস্ত করল রবিন। 'ওটা দা হাইমস অভ দ্য ব্যাটলের সুর। মিস কারমাইকেলের কাছ থেকে শিখে এসেছে।'

কিন্তু শঙ্কা গেল না মেরিচাচীর। তাঁর মনে হতে লাগল, কোথাও কিছু একটা গোলমাল হয়েছে। সকালে বেশি খেয়ে ফেলায় কিশোরের পেটে পাচক রসের ক্ষরণে বিঘ্ন ঘটেছে হয়তো, সেটা প্রতিক্রিয়া করেছে মাথায়। বললেন, 'কিসের সুর বললি?'

'ব্যাটল্ অভ দা হাইমস,' আবার বলল রবিন।

'এই কিশোর, খবরদার, আর কক্ষনো গাইবি না। যার গলায় যেটা মানায় না...'

'বেশ গাইব না,' শান্ত কণ্ঠে বলল কিশোর। 'তবে কথা দিতে হবে, আর কক্ষনো তুমিও খাওয়ার জন্যে চাপাচাপি করবে না।'

'ওহ্‌হো, ভুলেই গিয়েছি,' এড়িয়ে যাওয়ার জন্যে তাড়াতাড়ি বললেন মেরিচাচী, 'দুজন লোক দেখা করতে এসেছে তোর সঙ্গে। গেটের কাছে দাঁড়িয়ে আছে,' বলেই আর এক মুহূর্ত দাঁড়ালেন না। থাকলেই আবার কোন ফাঁদে ফেলে দেয় কিশোর। দ্রুত ভাগলেন।

সেদিকে চেয়ে মুচকি হাসল কিশোর। 'চলো,' হাত নাড়ল দুই সহকারীর দিকে চেয়ে।

গেটের বাইরে রাস্তায় পার্ক করা একটা ভ্যানের কাছে দাঁড়িয়ে আছে লোকগুলো। দুজনেরই বয়েস তিরিশের কাছাকাছি, গায়ে টী-শার্ট, পরনে নীল জিনসের প্যান্ট। দুজনেই জাপানী।

'তোমরা তিন গোয়েন্দা?' এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করল একজন। 'কিশোর, মুসা আর রবিন?'

'হ্যাঁ,' মাথা ঝাঁকাল কিশোর।

'মিস্টার মিটসুশিতাকে চেনো?'

'চিনি,' জবাব দিল রবিন। ওই ভদ্রলোকের কাছেই মেসেজ অনুবাদ করাতে নিয়ে গিয়েছিল।

ফিরে সঙ্গীকে কি বলল লোকটা। জাপানী ভাষা, অনুমান করল কিশোর। একই ভাষায় জবাব দিল সঙ্গী।

'ও আমার বন্ধু,' দ্বিতীয় লোকটাকে দেখিয়ে বলল প্রথমজন, 'নাম হ্যারিকিরি। ওর কয়েকটা প্রশ্ন আছে, জবাব দিলে খুব খুশি হবে। ইংরেজী জানে না। ওর হয়ে আমিই প্রশ্ন করছি, কেমন?'

সম্মতি জানাল কিশোর।

'গুড,' বলল লোকটা। 'জাপানীতে লেখা একটা মেসেজ নিয়ে গিয়েছিলে মিস্টার মিটসুশিতার কাছে। উনি হ্যারিকিরিকে বলেছেন সেকথা। তার হাতের লেখা চিনতে পেরেছেন।'

প্রশ্ন নয়, কাজেই চুপ করে রইল কিশোর।

'মেসেজটা কোথায় পেয়েছ?' এবার প্রশ্ন।

ভাবছে কিশোর, জবাব না দিলেও পারে সে, তবে দিলে হয়তো তার কয়েকটা প্রশ্নের জবাবও মিলতে পারে। বলল, 'একটা মরা কবুতরের পায়ে আটকানো ছিল।'

হাসল লোকটা। হ্যারিকিরির কাছে গিয়ে তার হাত ধরে টেনে নিয়ে গেল ভ্যান থেকে খানিক দূরে।

চেয়ে আছে রবিন, জাপানী ভাষায় কথা বলছে লোকগুলো। তার মনে হলো, দুজনেরই এক চেহারা, একই রকম কালো চুল, ঠেলে বেরোনো চোয়াল, হালকা বাদামী চামড়া। রাস্তায় হঠাৎ আরেকদিন দেখলে বলতে পারবে না, কে হ্যারিকিরি আর কে অন্য লোকটা।

হয় এ-রকম। এক দেশের লোক অন্য দেশের লোকের চেহারায় বিশেষ তফাৎ দেখতে পায় না—সব ক্ষেত্রে হয় না এটা। তবে সব চেয়ে বেশি হয় আফ্রিকান ও ককেশিয়ানদের, রবিনের তাই ধারণা।

কিশোরও স্থির দৃষ্টিতে চেয়ে আছে দুজনের দিকে। ফিসফিস করে বলল, 'সেই সবুজ ভ্যানটা, স্ন্যাকস রেস্টুরেন্টে যেটা দেখেছিলাম। এটাকে অনুসরণ করতে পারলে...' জাপানী দুজন এখনও আলাপরত, সেদিকে চেয়ে থেকেই বলল সে, 'রবিন বীপারটা আনতে পারবে? ওরা যাতে সন্দেহ করতে না পারে।'

'দেখি চেষ্টা করে,' ফিসফিসিয়ে জবাব দিল রবিন। কিশোরের কাছ থেকে সরে দাঁড়াল। পেছনে চেয়ে কান পেতে কি যেন শোনার ভঙ্গি করল, তারপর লোক দুজনকে শুনিয়ে জোরে জোরে বলল, 'কিশোর, মনে হচ্ছে ডাকছেন। যাই, শুনে আসি।'

অপেক্ষা করল না রবিন, ঘুরে রওনা হয়ে গেল।

আবার ফিরে এল দুই জাপানী। হ্যারিকিরির সঙ্গী কিশোরকে বলল, 'আরেকটা প্রশ্ন, কোথায় পেয়েছ কবুতরটা?'

এটাও ভেবে দেখল কিশোর। মিথ্যা বলতে বাধে তার, কিন্তু গোয়েন্দাগিরি এমনই একটা কাজ, সময়ে না বলেও পারা যায় না। এ-ক্ষেত্রে মিছে কথা বলার দরকার আছে কিনা, ভাবল। সেটা কি অন্যায় হবে? বোধহয় না। কারণ, তার মক্কেলের সপক্ষে বলতেই হবে তাকে, আর মিস কারমাইকেল তার মক্কেল।

'পথের ওপর পেয়েছি,' মিছে বলল না কিশোর, কিন্তু খোলাসাও করল না।

'কোন পথে?'

'শহরের পুব ধারের একটা পথ।'

আবার হাসল লোকটা। 'তৃতীয় প্রশ্ন, কি করে মারা গেছে কবুতরটা, জানো?'

'না,' সত্যই জানে না কিশোর। তবে জানতে পারলে ভাল হত।

'দেখে কি মনে হয়েছে? গুলি-টুলি করে মেরেছে?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। পেছনে পায়ের আওয়াজ শুনে বুঝল, রবিন আসছে। 'আর যেভাবেই মারা হোক, গুলি নয়, এটা ঠিক।'

'গুড। থ্যাংক ইউ,' বলে হ্যারিকিরিকে নিয়ে গাড়ির দিকে রওনা হলো লোকটা।

পৌঁছে গেল রবিন।

দুই লাফে এগিয়ে গিয়ে প্রথম লোকটার বাহুতে হাত রাখল কিশোর। 'আমি তো আপনার কথার জবাব দিলাম, এবার আমার কয়েকটা প্রশ্নের জবাব দেবেন, প্লীজ?'

এইবার লোকটার ভাবনার পালা। ভেবে নিয়ে বলল, 'কি প্রশ্ন?'

'মেসেজে লেখা ছিল ঃ আজ মুক্তো নেই। মিস্টার সিটসুশিতা অনুবাদ করে তো তাই বললেন।'

'হ্যাঁ।'

আড়চোখে রবিনের হাতের দিকে তাকাল কিশোর, ছোট্ট যন্ত্রটা আছে। লোকটার দিকে ফিরে বলল, 'এর মানে কি?' বোকার অভিনয় খুব ভাল করতে পারে কিশোর, এ-মুহূর্তে তাকে দেখলে মনে হবে তার মত হাঁদারাম, মাথামোটা ছেলে দুনিয়ায় আর দ্বিতীয়টি নেই। 'কথাটার মাথামুণ্ডু কিছুই বুঝলাম না। কিসের মুক্তো, কিসের আজ?' বোকার মতই হাত নাড়ল সে।

হ্যারিকিরির দিকে তাকাল লোকটা, এই সুযোগে পাশে দাঁড়ানো রবিনের গায়ে খোঁচা দিয়ে ইঙ্গিত করল কিশোর।

ফিরল লোকটা, হাসল। 'খুব সহজ। আমার বন্ধু হ্যারিকিরি তরকারির চাষ করে। খেত আছে। জাপানী পাড়ায় বাজারে বিক্রি করে সেই তরকারি। খেতগুলো বাজার থেকে দূরে, উপকূলের কাছে। দোকানদাররা জানতে চায়, কি তরকারি আছে তার কাছে…'

হাঁ করে আছে কিশোর, বোকা বোকা দৃষ্টিতে সামান্যতম পরিবর্তন নেই। চোখের কোণ দিয়ে দেখছে, ভ্যানের দিকে এগিয়ে যাচ্ছে রবিন।

পৌঁছল রবিন। পেছনের বাম্পারের কাছে দাঁড়িয়ে চট করে একবার নিচু হয়েই সোজা হলো।

'…কাজেই খবর জানাতে হয় হ্যারিকিরিকে,' বলে যাচ্ছে লোকটা। 'কবুতর দিয়ে মেসেজ পাঠাতে পয়সা লাগে না, তাছাড়া তাড়াতাড়িও হয়, তাই পুরানো পদ্ধতিই বেছে নিয়েছে আমার বন্ধু। লিখে দেয় ঃ আজ শালগম আসছে, আজ বাঁধাকপি কিংবা গাজর।'

হাত নাড়ল রবিন। দু-হাতের মুঠোই খোলা, তারমানে কাজ হয়ে গেছে।

'তাই নাকি?' খুব অবাক হয়েছে কিশোর। 'আপনার বন্ধু কি মুক্তোও ফলায় নাকি? ওগুলো সব্জি না ফল?'

জোরে হেসে উঠল লোকটা। মনে মনে 'আস্ত গর্দভ' ভাবছে কিশোরকে, বুঝল

কিশোর। 'মুক্তো সব্জিও না, ফলও না। সাগরে হয়, ঝিনুকের পেটে, একধরনের মূল্যবান পাথর। আমার বন্ধু যে মুক্তোর কথা লিখেছে, সেটা পেঁয়াজ। মুক্তো-পেঁয়াজ বলে।'

'অ। থ্যাংক ইউ,' বলল কিশোর। 'আপনার কাছে অনেক কিছু জানা গেল।'

কিশোরকে আরেকবার ধন্যবাদ জানিয়ে গাড়িতে গিয়ে উঠল লোকটা। তার পাশে বসল হ্যারিকিরি। স্টার্ট নিল এঞ্জিন।

গাড়িটা মোড়ের কাছে পৌঁছতেই লাফিয়ে উঠল কিশোর। 'রবিন, জলদি, ট্র্যাকারটা।'

বুদ্ধি করে নিয়েই এসেছে রবিন, গেটের ভেতরে এক জায়গায় রেখে এসেছে। এক ছুটে গিয়ে নিয়ে এল। ছোট একটা বাক্স মত, তাতে অ্যান্টেনা লাগানো। পুরানো আমলের একটা রেডিওকে পরিবর্তন করে বীপারের সিগন্যাল ধরার যন্ত্র বানিয়েছে কিশোর। সুইচ টিপে ডায়াল ঘোরাল সে।

বীপ। বীপ। বীপ।

স্পষ্ট শব্দ ভেসে এল যন্ত্রটার স্পীকারে। কাজ করছে ভ্যানের বাম্পারে লাগানো বীপার, চুম্বকের সাহায্যে ওটাকে আটকে দিয়েছে রবিন।

অ্যান্টেনাটা দক্ষিণে ঘোরাল কিশোর।

আরও স্পষ্ট হলো বীপ-বীপ।

'উপকূলের দিকে যাচ্ছে,' বলল কিশোর। 'চলো, আমরাও যাই।'

বলতে হয়নি, ইতিমধ্যেই এক এক করে তিনটে সাইকেল গেটের বাইরে নিয়ে এসেছে মুসা।

দ্রুত প্যাডাল ঘুরিয়ে চলেছে ওরা। নিজের সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে ট্র্যাকারটা বেঁধে নিয়েছে কিশোর। এক হাতে হ্যাণ্ডেল ধরেছে, আরেক হাতে অ্যান্টেনার মাথা ঘোরাচ্ছে এদিক ওদিক। শব্দের কম-বেশি শুনে অনুমান করছে, কোনদিকে গেছে ভ্যান।

গাড়ির খুব বেশি কাছে যাওয়ার দরকার নেই, এক মাইল দূর থেকেও সঙ্কেত দেবে বীপারটা। সহজেই অনুসরণ করতে পারছে কিশোর। গাড়ি এখন স্যান ফ্রানসিসকোর দিকে না গেলেই বাঁচি—মনে মনে বলল সে।

# আট

কয়েক মিনিট পুরোদমে প্যাডাল ঘোরানোর পর স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। সবুজ ভ্যানটা স্যান ফ্রানসিসকোর দিকে যাচ্ছে না, এমনকি সান্তা মনিকার দিকেও নয়। সোজা শহরের দিকে।

সিগন্যালের শব্দ পরিষ্কার বলে দিচ্ছে কোনদিকে কখন মোড় নিচ্ছে গাড়িটা। রকি বীচের মেইন স্ট্রীট দিয়ে চলেছে এখন। ইশারায় গতি কমানোর নির্দেশ দিল দুই সহকারীকে কিশোর। সিগন্যাল অনেক জোরাল, তারমানে খুব কাছেই রয়েছে গাড়ি। ট্র্যাফিক পোস্টে লাল আলো দেখে থেমেছে বোধহয়। তাড়াতাড়ি চলে

ওটার একেবারে গায়ের ওপর গিয়ে পড়তে চায় না সে। রিয়ার ভিউ মিররে তাদের দেখে ফেলতে পারে হ্যারিকিরি বা তার সঙ্গী।

রিচার্ড হ্যারিসের অলঙ্কারের দোকান আর ট্রাসটি ব্যাঙ্ক পেরোল ওরা। হঠাৎ থেমে গেল বীপ-বীপ। হাত তুলে মুসা আর রবিনকে থামার নির্দেশ দিল কিশোর। এক পা মাটিতে নামিয়ে দিয়ে সাইকেলেই বসে রইল। এদিক ওদিক ঘোরাল ট্র্যাকারের অ্যান্টেনা। বাঁয়ে ঘোরাল, শব্দ নেই। পুরো ডানে ঘোরাতেই আবার শোনা গেল বীপ-বীপ।

সামনে পথটাকে আড়াআড়ি কেটেছে আরেকটা পথ, শহরের বাইরে বেরিয়ে ঘুরে ঘুরে উঠে গেছে পাহাড়ের ওপর। সে-পথেই এগিয়ে চলল তিন গোয়েন্দা।

রাস্তায় মোড় আর ঘোরপ্যাচ এত বেশি এখন, সিগন্যাল শুনে ভ্যানটাকে অনুসরণ করা কঠিন হয়ে দাঁড়াল। এই আছে জোরাল বীপ-বীপ, পরক্ষণেই কমতে কমতে একবারে মিলিয়ে যাচ্ছে। সিগন্যাল ধরার জন্যে বার বার অ্যান্টেনা ঘোরাতে হচ্ছে, তবে বিশেষ ভাবছে না কিশোর। আন্দাজ করে ফেলেছে, কোথায় যাচ্ছে ভ্যান।

রকি বীচের উত্তর-পশ্চিমে নিচু পাহাড়শ্রেণীর ঢালের গায়ে আর পাদদেশে বেশ কিছু বাড়িঘর আছে। জায়গাটা লিট্‌ল্ টোকিও নামে পরিচিত, রকি বীচের জাপানী পল্লী।

লিট্‌ল্ টোকিওর সীমানায় পৌছেই আবার থামার নির্দেশ দিল কিশোর। শ-খানেক গজ দূরে একটা একতলা বাড়ির গাড়ি বারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সবুজ ভ্যান।

পথের ধারে সাইকেল রাখল তিন গোয়েন্দা, গাছের সারির আড়ালে লুকিয়ে চোখ রাখল বাড়িটার ওপর।

'হ্যারিকিরির বাড়ি নাকি?' বলল মুসা।

জবাব দিল না কিশোর। ভ্যানের দিকে তাকিয়ে আছে।

গাড়িবারান্দায় একজন লোক, গাড়িটার পাশ কাটিয়ে আসছে। বাড়ির ভেতরে থেকেই বেরিয়েছে মনে হয়। রাস্তায় এসে নামল লোকটা। আরেকটা লাল গাড়ি পার্ক করা ওখানে, তাতে চড়ে চলে গেল।

'হ্যারিকিরি?' শিওর হতে পারছে না রবিন। সব জাপানীর চেহারাই এক রকম লাগে তার কাছে।

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর, 'তার সঙ্গী।'

কিশোরের দৃষ্টিশক্তির ওপর পুরো আস্থা রয়েছে রবিনের, তবু জিজ্ঞেস না করে পারল না, 'কি করে বুঝলে?'

'সহজ। ওর হাঁটা, ওর চোখ, ওর কান। কেন, আরেকটা জিনিস খেয়াল করোনি? কোমরের বেল্ট, আর প্যান্টে লেগে থাকা গ্রিজের দাগ?'

খেয়াল করেনি রবিন। অতি সাধারণ জিনিস বলেই।

'তাহলে, ধরে নিতে অসুবিধে নেই, ওটা হ্যারিকিরিরই বাড়ি,' বিড়বিড় করল কিশোর, 'কিন্তু এই *ধরে নেয়ার* ব্যাপারটায় মোটেই সন্তুষ্ট হওয়া যায় না। শিওর হওয়া দরকার। ডাকবাক্সটায় নাম দেখলে বোঝা যাবে কার বাড়ি।'

ডাকবাক্স দেখতে হলে বাড়ির কাছে যেতে হবে। বাক্সটা এপাশে আছে না ওপাশে, বলা যাচ্ছে না, ওপাশে থাকলে বাড়ির পাশ কাটিয়ে যেতে হবে।

'রবিন তুমি যাও,' বলল কিশোর। 'মুসা বেশি লম্বা। আমারও চুল বেশি কোঁকড়া, দূর থেকেই চোখে পড়ব দুজনে। জানালার কাছে যদি হ্যারিকিরি থাকে, সহজেই আমাদের চিনে ফেলবে। তোমার উইণ্ডচীটারটা খুলে চুলগুলো এলোমেলো করে নাও। আর দশজন আমেরিকান ছেলের সঙ্গে তোমার তফাত বুঝতে পারবে না সে, তুমি যেমন জাপানীদের আলাদা করে চিনতে পারো না।'

'ও-কে,' আর দশটা সাধারণ ছেলের মতই দেখতে, জেনে খারাপ লাগছে রবিনের। তবে সে চোখে পড়ার মত নয় বলে গোয়েন্দাগিরিতে উন্নতি করতে পারবে ভেবে ভালও লাগছে। চিঁয়াত করে চেন টেনে উইণ্ডচীটার খুলে কিশোরের হাতে দিয়ে রওনা হলো রবিন।

গাড়িবারান্দার ধারেই রয়েছে সাদা রঙ করা ডাকবাক্স। দেখেও থামল না রবিন, সোজা হেঁটে গেল আরও খানিকটা—যেন এখানকার কোন কিছুর প্রতি কোন আগ্রহই নেই তার—তারপর থেমে ফিরে তাকাল।

লেখা রয়েছে ঃ এম হ্যারিকিরি।

সাদা বাক্সে উজ্জ্বল কালো কালিতে লেখা অক্ষরগুলো ফুটে রয়েছে : পড়তে কোন অসুবিধে হলো না। ঘুরে আবার পা বাড়াতে যাবে, এই সময়েই জাগল সন্দেহটা। মনে হলো, হ্যারিকিরির আগে আরেকটা নাম লেখা ছিল ঠিক ওই জায়গাটাতেই।

নিশ্চিত হতে হলে ভালমত দেখা দরকার। তার জন্যে আরও কাছে যেতে হবে। ঝুঁকিটা নেবে সে ঠিক করল।

ঠিকই সন্দেহ করেছে রবিন। সাদা রঙের প্রলেপ দিয়ে ঢেকে দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে আগের লেখা, তবে তেমন যত্ন নেয়নি, নইলে চোখে পড়ত না। কখন রঙ করা হয়েছে? সতর্ক দৃষ্টিতে বাড়ির দিকে তাকাল সে, কাউকে দেখা যাচ্ছে না। আরও এগোল, চলে এল বাক্সের একেবারে কাছে। ছুঁয়ে দেখল, আঠা আঠা লাগে। হুঁ, বেশিক্ষণ হয়নি, তাই এমন চকচকে। বাড়িও কি এই কিছুক্ষণ আগে বদলাল নাকি হ্যারিকিরি?

কাজের কাজ করেছি একটা, নিজের প্রশংসা না করে পারল না রবিন। কিশোরও এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারত কিনা সন্দেহ। বন্ধুদেরকে খবরটা জানানোর জন্যে তাড়াতাড়ি ঘুরে রওনা হলো সে।

দুই কদম এগিয়েই শব্দ শুনে ফিরে তাকাল রবিন, স্থির হয়ে গেল পাথরের মত। গাড়িবারান্দার ওধার থেকে আসছে একজন লোক। বেঁটে, কালো কোট গায়ে, ডোরাকাটা প্যান্ট, মুখে দাঁড়িগোঁফের জঙ্গল। কালো চশমা নেই এখন চোখে।

'এই ছেলে, শোনো, এই,' ডাকল রিচার্ড হ্যারিস।

দৌড়ে পালাতে চাইল রবিন। পারল না। পা কথা শুনছে না। অনেক সময় দুঃস্বপ্নে যেমন প্রচণ্ড ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও হাত-পা নাড়ানো যায় না, অনেকটা যেন সেই রকম।

কাছে এসে দাঁড়াল হ্যারিস। লোকটার হাতে লাঠি নেই, কিন্তু তাতে কি? পকেটে পিস্তল তো থাকতে পারে।

'ভালই হলো,' বলল হ্যারিস, 'তোমাদেরকেই খুঁজছি মনে মনে।'

ঠোঁট ভালমত দেখা যায় না, ফলে হাসছে কি না বোঝা গেল না। তবে চোখ দুটো আন্তরিকতা মাখানো বলে মনে হলো রবিনের।

'অন্যেরা কোথায়? তোমার বন্ধুরা?'

ভেবেছিল হাতও নড়াতে পারবে না, কিন্তু পারল, হাত তুলে দেখাল রবিন রাস্তার দিকে। হ্যারিসকে সঙ্গে নিয়ে হাঁটতে শুরু করল।

সাইকেলের হ্যাণ্ডেলে বাঁধা ট্র্যাকারটা রবিনের উইণ্ডচীটার দিয়ে ঢেকে দিয়েছে কিশোর।

'লিট্‌ল্ টোকিওতে প্রায়ই আসো তোমরা?' জিজ্ঞেস করল হ্যারিস।

'জাপানী রেস্টুরেন্টে খেতে আসি,' জবাব দিল কিশোর। 'জাপানী খাবার মুসার খুব পছন্দ।'

'হ্যাঁ, ভাল খাবার। বিশেষ করে ফুজিয়ামা, আমিও যাই মাঝেমধ্যে,' বলল হ্যারিস। হাসল কিনা বুঝতে পারল না রবিন। 'চলো না আজও যাই। আমি লাঞ্চ খাওয়াব তোমাদের?'

দ্বিধা করছে কিশোর, কি জবাব দেবে? শেষবার যখন হ্যারিসের সঙ্গে দেখা হয়েছে, তার দিকে পিস্তল তাক করে রেখেছিল। তার আগের বার লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরে মাথা ফাটিয়ে দিতে চেয়েছিল। সেই লোকই এখন লাঞ্চের দাওয়াত দিচ্ছে, ঘটনাটা কি?

'ঠিক আছে, খাইয়ে যদি খুশি হন,' অবশেষে বলল কিশোর। 'আমাদের আপত্তি নেই। থ্যাংক ইউ।'

'চলো তাহলে,' হাঁটতে শুরু করল হ্যারিস। তাকে অনুসরণ করল তিন গোয়েন্দা, যার যার সাইকেল ঠেলে নিয়ে চলেছে।

কিশোরের কাছাকাছি রইল রবিন। ফিসফিস করে বলল, কি কি দেখে এসেছে।

নীরবে মাথা নোয়াল শুধু কিশোর।

রেস্টুরেন্টের বাইরে সাইকেল স্ট্যাণ্ডে তুলে রাখল ওরা।

ছেলেদেরকে নিয়ে কোণের একটা বড় টেবিলে এসে বসল হ্যারিস।

ওয়েইটার এসে জাপানী ভাষায় কিছু জিজ্ঞেস করল, হ্যারিসও একই ভাষায় জবাব দিল।

বাহ্ গহনার দোকানের মালিক দেখছি আবার ভাষাবিদও—মনে মনে বলল মুসা। তা অর্ডার কি দিল? সাপ-ব্যাঙ না হলেই বাঁচি এখন।

'জাপানে ছিলাম কয়েক বছর,' ছেলেদেরকে জানাল হ্যারিস। 'মুক্তোর ব্যবসা করতাম। সেখানেই ভাষাটা শিখেছি।'

শুরুতেই চা নিয়ে এল ওয়েইটার। সবার কাপে কাপে ঢেলে দিল হ্যারিস। আবার চেয়ারে বসে বলল, 'জানালাম, তোমরা গোয়েন্দা।'

এইবার হাসিটা দেখতে পেল রবিন। কিছু বলল না। অন্য দুজনও চুপ।

'মিস কোরিন কারমাইকেল তোমাদের মক্কেল,' আবার বলল হ্যারিস। 'পাখি খুনের তদন্ত করছ।'

মাথা নোয়াল কিশোর।

'হ্যারিকিরি বলল একটা মরা কবুতরের পায়ে বাঁধা একটা মেসেজ পেয়েছ তোমরা।'

আবার মাথা নোয়াল কিশোর, মুখে কিছু বলল না।

'বাজারে যে তরকারী সাপ্লাই দেয়, সে ব্যাপারে নাকি কিছু লেখা ছিল।'

'হ্যাঁ, মুক্তো-পেঁয়াজ,' বলল কিশোর।

ওয়েইটার ফিরে আসায় আলোচনায় বাধা পড়ল। ছোট ছোট ডজনখানেক ডিশ টেবিলে নামিয়ে রেখে চলে গেল।

নীরবে খাওয়া চলল কিছুক্ষণ।

'কবুতরটা কি মিস কারমাইকেলের বাগানে পেয়েছ?' মুখ তুলল হ্যারিস।

'না,' কিশোরের মুখভর্তি সরু চালের ভাত, স্যামন মাছ, বাঁশের কোঁড় আর নোনা সালাদ, চমৎকার খাবার। গিলে নিয়ে বলল, 'রাস্তায় পেয়েছি।' হ্যারিকিকে যা যা বলেছে, হ্যারিসকেও ঠিক তাই বলবে।

আবার নীরবে খেয়ে চলল হ্যারিস। শেষ করে ন্যাপকিন দিয়ে মুখ মুছল। তারপর হাত ঢোকাল পকেটে।

স্থির হয়ে গেছে মুসা, মুখের সামনে থেমে গেল কাঁটাচামচে গাঁথা মাছের টুকরো। পিস্তল বের করবে না তো লোকটা? এই প্রকাশ্য জায়গায় সাহস পাবে?

মানিব্যাগ বের করল হ্যারিস।

'ব্যাপার হলো কি জানো মিস কারমাইকেল আমার খুব ভাল বন্ধু, খুব দামী কাসটোমার,' ক্ষণিকের জন্যে উজ্জ্বল হলো তার চোখ। 'পাখি কি-রকম ভালবাসে জানি, ওগুলো মারা পড়লে কতখানি দুঃখ পায় তা-ও জানি। ওকে সাহায্য করতে চাই আমি, যতটা পারি,' মানিব্যাগ থেকে পঞ্চাশ ডলারের একটা নোট বের করে কিশোরের দিকে বাড়িয়ে ধরল। 'নাও, এটা রাখো। তোমাদের ফিসের কিছুটা, আগাম। তদন্ত চালিয়ে যাও। দরকার হলে আরও দেব। কে পাখিগুলোকে খুন করেছে,' ব্যাগটা আবার পকেটে রাখতে রাখতে বলল, 'জানার চেষ্টা করো।'

'থ্যাংক ইউ,' নোটটা নিয়ে পকেটে ঢোকাল কিশোর। 'আমাদের সাধ্যমত চেষ্টা করব।'

'হ্যাঁ, সাধ্যমতই করব,' বাইরে বেরিয়ে সাইকেলের তালা খুলতে খুলতে আরেকবার বলল কিশোর, চোখ হ্যারিসের দিকে, চলে যাচ্ছে গহনার দোকানের মালিক।

'নিশ্চয় করব,' বলল মুসা, 'পঞ্চাশ ডলার···' থেমে গেল কিশোরের দিকে তাকিয়ে।

চিন্তায় মগ্ন গোয়েন্দাপ্রধান, তার কথা শুনছে বলে মনে হলো না।

'ওর দোকানে টমকে নিয়ে গেলাম,' বিড় বিড় করল কিশোর। 'পায়রাটা তার প্রয়োজন হলে সে বলত ঃ হ্যাঁ, চিনেছি। জানি, কার। রেখে যাও, মালিকের কাছে

ফিরিয়ে দিয়ে আসব।' মাথা নাড়ল সে, যেন কিছু একটা ব্যাপার বিশ্বাস হচ্ছে না। 'তা না করে বলল ঃ জীবনে দেখিনি। পায়রাটাকে নিয়ে বেরিয়ে এলাম, তা-ও কিছু বলল না। তারপর, পিস্তল দেখিয়ে আমার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিল।' থামল এক সেকেণ্ড, নিচের ঠোঁটে চিমটি কাটতে কাটতে আবার মাথা নাড়ল। 'মিস কারমাইকেলের বাগানে রাতের অন্ধকারে লাঠি দিয়ে বাড়ি মেরে আমার মাথা ফাটিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল। সবশেষে, আজ ডেকে এনে লাঞ্চ খাওয়াল...' ভ্রূকুটি করল। 'হ্যাঁ, লাঞ্চ খাওয়াল। টাকাও দিল। পাখির খুনীকে ধরে দিতে পারলে আরও টাকা দেবে বলল। অবাকই লাগছে, এতগুলো পরস্পর বিরোধী কাণ্ড। কিন্তু সব চেয়ে অবাক করেছে রিচার্ড হ্যারিস,' হঠাৎ যেন বাস্তবে ফিরে এল সে।

'কি?' খেই ধরিয়ে দেয়ার চেষ্টা করল রবিন। 'বলো না, কি? কেন অবাক করল রিচার্ড হ্যারিস?'

'শুধু রাতের বেলা কালো কাচের চশমা পরে।'

# নয়

কিছু বলতে গিয়েও থেমে গেল মুসা, মাথা নেড়ে বারণ করছে কিশোর। কথা বলা বৃথা এখন। চেঁচামেচির জন্যে বোঝা যাবে না ঠিকমত, অযথা চেঁচিয়ে গলা ফাটানোই সার হবে।

হ্যারিস যেদিন লাঞ্চ খাইয়েছে তার পরদিন শেষ বিকেলের ঘটনা। সাইকেল নিয়ে মিস কারমাইকেলের বাড়ি এসেছে তিন গোয়েন্দা।

লিট্‌ল্ টোকিও থেকে বাড়ি ফিরে গিয়েই মহিলাকে ফোন করেছিল কিশোর, পরদিন সকালে তাঁর বাড়িতে যাওয়ার অনুমতি চেয়েছিল। পেয়েছিল অনুমতি, কিন্তু সকালে বেরোতে পারল না। কোথা থেকে জানি বিশাল এক পুরানো রেফ্রিজারেটর আর কতগুলো বাতিল পুরানো আমলের লোহার চুলা নিয়ে এসেছেন রাশেদ পাশা। বরাবরের মতই চাচী গেছেন রেগে। তাঁদের ঝগড়া থামাতে হয়েছে কিশোরকেই, এরপর কাজে লাগতে হয়েছে। তার ওপর আগের রাতে হয়েছে বৃষ্টি। বাইরে চত্বরে ফেলে রাখা কিছু জিনিস মুছে গোছগাছ করতে করতে দুপুর। খেয়ে ইয়ার্ডের আরও কিছু জরুরী কাজ সেরে বেরোতে বেরোতে একেবারে বিকেল।

আজ আর রাত করবে না, ভাবল কিশোর। কাজ শেষ করে রাতের আগেই ফিরে যাবে। কে জানে, আজ কি নিয়ে ঝোপের ভেতর অপেক্ষা করছে রিচার্ড হ্যারিস। হয়তো ইয়া বড় এক রাম দা। ঘাড়টা নাগালে পেলেই দেবে কোপ মেরে।

বেল বাজার সঙ্গে সঙ্গে সাড়া দিলেন মিস কারমাইকেল। কালো মখমলের লম্বা হাতাওয়ালা পোশাক পরেছেন, শোক প্রকাশের জন্যে। বার বার রুমাল দিয়ে চোখ মুছছেন। ছেলেদেরকে নিয়ে এলেন সাউণ্ডপ্রুফ ঘরে।

'দেখো,' আর কিছুই বলতে পারলেন না, কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। শুধু হাত তুলে দেখিয়ে দিলেন টেবিলের দিকে।

সাদা কাপড়ের ওপর পড়ে আছে আরেকটা বাজ পাখি।

টেবিলের দিকে এগোচ্ছে মুসা, কি মনে করে মিস কারমাইকেলের কাঁধ থেকে উড়ে এসে মুসার মাথার ওপর এক মুহূর্ত ফড়ফড় করল তোতাটা, তারপর কাঁধে বসে পড়ল।

'কি নিষ্ঠুর!' রীতিমত ফোঁপাচ্ছেন এখন মিস কারমাইকেল।

'নিষ্ঠুর!' প্রতিধ্বনি করল তোতাটা। 'নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর!'

মরা বাজটাকে পরীক্ষা করে দেখল কিশোর। আঘাতের কোন চিহ্ন নেই। অন্য বাজটার মত এটাকেও বোধহয় বিষ খাইয়ে মারা হয়েছে।

'কখন পেয়েছেন এটা?' জিজ্ঞেস করল সে।

সামলে নেয়ার চেষ্টা করলেন মিস কারমাইকেল, ফোঁপানী বন্ধ হয়েছে, তবে বার বার রুমাল দিয়ে চোখ মোছা থামেনি। 'এই তো, খানিক আগে।'

'কোথায়?'

'আগের জায়গায়,' ঢোক গিললেন, আঙুল বোলালেন মুক্তোর হারে। 'স্টীলকে যেখানে পেয়েছিলাম সেখানেই।'

'বাজের খাবার যেখানে রেখে আসেন?'

নীরবে মাথা ঝোঁকালেন মিস কারমাইকেল।

মহিলার অবস্থা দেখে খারাপই লাগছে কিশোরের, সহানুভূতি জানিয়ে বলল, 'আপনার এখন মনের অবস্থা কেমন, বুঝতে পারছি। তবু দয়া করে কয়েকটা প্রশ্নের জবাব যদি দেন...'

নীরবে মাথা কাত করলেন মিস কারমাইকেল। মুক্তোর হারে আঙুল বুলিয়েই চলেছেন, বোধহয় বেদনা কিছুটা লাঘব হচ্ছে এতে।

'চেষ্টা করব,' বললেন তিনি।

'আগের বার যখন এসেছিলাম,' বলল কিশোর, 'আপনার পোষা দোয়েল, হীরা...' থেমে গেল সে, আবার না পুরানো শোক মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে মহিলার, কেঁদে ফেলেন, তাহলে তার প্রশ্নের জবাব পাওয়ার আর আশা নেই।

কিন্তু কাঁদলেন না মিস কারমাইকেল, মাথা ঝাঁকালেন শুধু।

'আপনি বলেছেন, পাখিটা নাকি নানারকম জিনিস কুড়িয়ে আনার ওস্তাদ ছিল।'

'মুক্তো,' প্রিয় অতীতের কথা মনে করে মলিন হাসি ফুটল মিস কারমাইকেলের ঠোঁটে। 'তিন তিনটে মুক্তো এনে দিয়েছিল আমাকে।'

'বলেছিলেন, দুটো দোয়েল আছে আপনার। আরেকটার নাম কি?'

'পান্না।'

'সে-ও কি জিনিস এনে দেয়?'

'মাঝেমধ্যে,' রুমালটা পকেটে ঢুকিয়ে রাখলেন মিস কারমাইকেল, আর কাঁদবেন না স্থির করেছেন বোধহয়, 'কিন্তু হীরার তুলনায় পান্না কোন কাজেরই না। যত সব অকাজের জিনিস কোত্থেকে গিয়ে নিয়ে আসে, একেবারেই বাজে।'

মরা বাজটার দিকে চেয়ে আনমনে ঠোঁট কামড়াচ্ছে কিশোর। 'কখনও কোন মেসেজ এনে দিয়েছে?'

'মেসেজ?'

'এই, কাগজের টুকরো। তাতে লেখা-টেখা কিছু?'

'না আনেনি। তেমন কিছু কখনও আনলে মনে থাকত। এই তো, আজ সকালে···দেখো না, কি এনেছে। দেখতে চাও?'

অবশ্যই দেখতে চায়, জানাল কিশোর।

সাইড টেবিলের ওপর থেকে একটা কাঁচের অ্যাশট্রে নিয়ে এলেন মিস কারমাইকেল। বাড়িয়ে ধরলেন কিশোরের দিকে।

দেখল কিশোর। চুল দিয়ে পাকানো খুদে একটা বল। হাতে নিয়ে পরীক্ষা করল সে। খসখসে, কালো কোঁকড়ানো চুল দিয়ে তৈরি। দোয়েল পাখির আজব খেয়াল, অনেক সময় নিয়ে ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে আশ্চর্য নৈপুণ্যে বানিয়েছে বলটা। মিস কারমাইকেলের অনুমতি নিয়ে যত্ন করে বলটা পকেটে রেখে দিল কিশোর। 'আচ্ছা, কোথায় পেয়েছে এটা, বলতে পারবেন?'

'না,' অ্যাশট্রেটা আবার আগের জায়গায় রেখে এলেন মিস কারমাইকেল। 'হীরা ও মুক্তোগুলো কোত্থেকে এনেছিল, জানি না।'

জানালার বাইরে তাকাল কিশোর। বেলা শেষ, তবে আঁধার হতে এখনও ঘণ্টা দুই বাকি। মুসা আর রবিনকে বলল, 'চলো যাই, আরেকবার ঘুরে দেখিগে বাগানে।' মিস কারমাইকেলের দিকে ফিরল, 'আপনার আপত্তি নেই তো?'

'না না, আপত্তি থাকবে কেন? তোমরা যা করছ আমার জন্যে, কে কার জন্যে করে? মিস্টার হ্যারিসের কাছেও আমি ঋণী। কিন্তু বাবা, কিছু মনে কোরো না, আমি তোমাদের সঙ্গে যেতে পারছি না। সইতে পারব না,' রুমাল বের করলেন তিনি। 'আবার যদি কিছু দেখি···' গলা কেঁপে উঠল তাঁর।

'ঠিক আছে ঠিক আছে, আপনি থাকুন,' তাড়াতাড়ি হাত নাড়ল কিশোর।

বিশাল জানালা দিয়ে কোলাহলের মধ্যে বেরিয়ে এল ওরা। তোতাটা বসে আছে মুসার কাঁধে। ওদের সঙ্গে বাগানে ঘোরার ইচ্ছে হয়েছে বুঝি। মুসা থাকতে দিল পাখিটাকে, টমের মতই তোতাটাকেও পছন্দ হয়েছে তার।

লনের প্রান্তে খোয়া বিছানো পথের ধারে এসে থামল ওরা। খানিক দূরে গাছ, যেটার তলায় মরে পড়ে ছিল দুটো বাজপাখি। আজ জায়গাটা পরিষ্কার। মাংসের টুকরো পড়ে নেই, পায়ের ছাপ নেই।

'চলো,' বনের দিকে দেখিয়ে চেঁচিয়ে বলল কিশোর, 'আলাদা হওয়ার দরকার নেই। এক সঙ্গে যাই।'

'সেটাই ভাল,' গলা ফাটিয়ে জবাব দিল মুসা। 'রিচার্ড হ্যারিসের লাঠির বাড়ি খেতে চাই না। তার মেজাজ আজ ভাল না মন্দ কে জানে।'

এক ঘণ্টা ধরে ঘোরাঘুরি করল তিন গোয়েন্দা, বনের ভেতর, ঝোপের ধারে, সরু পথে। বৃষ্টিতে ভিজে মাটি নরম হয়ে আছে কোথাও কোথাও। আজ আর কারও সঙ্গেই সাক্ষাৎ হলো না।

অবশেষে বনের ধারে ঘাসে ঢাকা ছোট একটা খোলা জায়গায় বেরিয়ে এল ওরা। আশ্চর্য নীরবতা এখানে। কোলাহলকারী পাখিরা যেন এড়িয়ে চলে

জায়গাটাকে, ওদের কলরব অনেক পেছনে।

শুকনো জায়গা দেখে বসে পড়ল কিশোর। হাঁপিয়ে উঠেছে, জিরিয়ে নেবে।

মুসা পা ছড়িয়ে বসল তার পাশে। খানিকদূরে একটা গাছে হেলান দিয়ে বসল রবিন।

প্রায় মিনিট পাঁচেক গেল। একটা রবিন এসে বসেছে তাদের কয়েক গজ সামনে. ভেজা মাটি থেকে ঠুকরে কেঁচো বের করে খাচ্ছে। আনমনে পাখিটাকে দেখছে মুসা।

নাহ, এবার ওঠা দরকার। উঠতে যাবে কিশোর, এই সময় একসঙ্গে তিনটে ঘটনা ঘটল. চোখের পলকে।

আতঙ্কে চিৎকার দিয়ে তোতাটা উড়ে গেল মুসার কাঁধ থেকে। মাথা তুলে আকাশের দিকে চেয়েই চমকে গেল রবিনটা। কালো একটা ছায়া পাথরের মত এসে পড়ল তার ওপর। পালানোর কোন সুযোগই পেল না পাখিটা। ভয়ানক এক শিকারী বাজ ঝাঁপিয়ে পড়েছে। ধারাল নখ আর ঠোঁট দিয়ে টেনে টেনে রবিনের শরীরটা নিমেষে ছিড়ে ফেলে, যা যা খাওয়ার বের করে নিল বাজ। মাংসটা নখে ঝুলিয়ে নিয়ে উড়ে চলে গেল রকেটের মত। মাটিতে পড়ে রইল শুধু রবিনের মাথা, পা দুটো আর কয়েকটা রক্তাক্ত পালক।

পুরো এক মিনিট কোনও কথা বলতে পারল না তিন কিশোর। ঘটনার আকস্মিকতায় বোবা হয়ে গেছে যেন ওরা।

গাছের ডাল থেকে ফিরে এসে আবার মুসার কাঁধে বসল তোতাটা। 'নিষ্ঠুর!' চেঁচিয়ে উঠল তীক্ষ্ণ স্বরে। 'নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর!'

'ঠিকই বলেছিস,' পাখিটার সঙ্গে একমত হলো কিশোর। 'তবে রবিনটা জীবন দিয়ে জানিয়ে দিয়ে গেল আমাদের, দু-আঙুলে পায়রাটাকে কে খুন করেছে।'

'এবং কেন বাজ মারছে কেউ,' যোগ করল রবিন। 'রেসিং হোমারদের খুন করে বলেই তো বাজ মারে, নাকি?'

'হ্যাঁ,' পকেট থেকে কাগজে মোড়া চুলের বলটা বের করল কিশোর। মোড়ক খুলে তাকাল। 'কিন্তু কে বিষ খাওয়াচ্ছে জানি না এখনও। হীরাকে পিটিয়ে মেরেছে কে, তা-ও জানি না।' উঠে দাঁড়াল সে। 'পায়ের ছাপ,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল, 'গতরাতে বৃষ্টি হয়েছে, মাটি জায়গায় জায়গায় এখনও ভেজা, ছাপ থাকতে বাধ্য। আমরা খুঁজে পাইনি, কিন্তু আছেই।' আকাশের দিকে তাকাল। 'এসো, যাই। আরও এক ঘণ্টা আলো থাকবে। এবার ভাগ হয়ে তিন দিকে চলে যাব, ছড়িয়ে পড়ে খুঁজব। মুসা, তুমি এদিকে যাও, রবিন তুমি ওদিকে। মাটিতে প্রতিটা ইঞ্চি দেখবে, বিশেষ করে কাদামাটি যেখানে আছে।'

'কিছু দেখলে কিভাবে জানাব?' জিজ্ঞেস করল রবিন। 'কি সঙ্কেত?'

'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি,' সঙ্গে সঙ্গে জবাব দিল কিশোর। 'জোরে জোরে গাইবে।'

'দি হাইমস অভ দা ব্যাটল?'

'না। অন্য সুর। এসো, আমার সঙ্গে সঙ্গে গাও। আমার সোনার বাংলা...'

কিশোরের সঙ্গে সঙ্গে বার করেক গেয়ে প্র্যাকটিস করে নিল মুসা আর রবিন। তারপর নিজে নিজে গাইল. কিশোরের চেয়ে গলা ভাল দুজনেরই, রবিন তো চমৎকার গাইল।

পায়ের ছাপ খোঁজার জন্যে তিনদিকে ছড়িয়ে পড়ল ওরা। মুসা খুঁজে পেল, মিনিট পনেরো পরে। সরু পথ ধরে এগিয়ে গেছে একজোড়া বুটের ছাপ, ভেজা নরম মাটিতে বেশ গভীর হয়ে বসেছে।

দাঁড়িয়ে পড়ল মুসা। আলো নিভে আসছে দ্রুত। রাতের সাড়া পেয়েই কলরব কমিয়ে দিয়েছে পাখির দল, শব্দ এখন অনেক কম। আবছা অন্ধকার বনপথে দাঁড়িয়ে অকারণেই গা ছমছম করে উঠল মুসার। ভয়ে ভয়ে তাকাল চারদিকে, মাথায় ডাণ্ডা মারতে আসছে না-তো আবার কেউ?

গান গাওয়ার জন্যে মুখ খুলল মুসা।

কিন্তু সুর ভুলে গেছে। অথচ তখন বেশ গেয়েছিল, এত তাড়াতাড়িই ভুলে গেল? গেছে, কি আর করবে। চেষ্টা করল, 'আ-আমার সোনার···দূর হচ্ছে না।' আবার চেষ্টা করল। হলো না।

'আমার সোনার বাংলা,' গেয়ে উঠল কাঁধে বসা তোতাটা, চমৎকার শিখে নিয়েছে, সুরও বেশ হয়েছে।

'ধন্যবাদ, তোতামিয়া,' হেসে আলতো চাপড় দিয়ে পাখিটাকে আদর করল মুসা। 'সাধনা করলে ওস্তাদ হতে পারতে।' গলা চড়িয়ে গাইল, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।'

কাছাকাছিই রয়েছে কিশোর আর রবিন, সাড়া মিলল সঙ্গে সঙ্গেই।

মিনিটখানেক পরই আবার একসাথ হলো তিনজনে।

গভীর মনোযোগে বুটের ছাপগুলো দেখল কিশোর। পকেট থেকে আবার বের করল চুলের বল। 'তাড়াতাড়িই পেয়েছ, মুসা, গুড। এগুলো হ্যারিসের নয়। গতকাল ওর সঙ্গে লাঞ্চ করার সময় ভালমত দেখেছি ওর জুতো। অনেক ছোট পা, জুতোর নাক ভোঁতা। সুতরাং,' চুলের বলটার দিকে তাকিয়ে বলল, 'এটা হ্যারিসের দাড়ি নয়। কাঁটা ঝোপে আটকে তার দাড়ি ছেঁড়েনি, যেটা খেলার সময় পেয়ে গিয়ে বল বানিয়েছে পান্না।'

আপাতত আর কিছু দেখার নেই। বন থেকে বেরিয়ে এল ওরা, যেখানে সাইকেল রেখেছে সেখানে।

দোতলায় মিস কারমাইকেলের শোবার ঘরে আলো জ্বলছে। কিশোর অনুমান করল, তিনি শুয়ে পড়েছেন. ঘুমিয়ে শোক ভুলতে চাইছেন।

'তাঁকে জানানোর মত এখনও কিছু আবিষ্কার করিনি আমরা,' কারও উদ্দেশে কথাগুলো বলছে না কিশোর। 'যা জানি, শুধুই অনুমান।'

'স্লিংকির পায়ের ছাপ সন্দেহ করছ?' রবিনের মনে পড়েছে, কিশোর বলেছিল, স্ন্যাকস রেস্টুরেন্টে চোখা মাথাওয়ালা বুট পরা ছিল স্লেটারের পায়ে।

'তাকে পয়লা সন্দেহ,' মাথা ঝাঁকিয়ে বলল কিশোর। 'দ্বিতীয় সন্দেহ হ্যারিকিরি। আমার ধারণা, সমস্ত রহস্যের চাবিকাঠি ওই জাপানীটা।'

'কেন?' জানতে চাইল মুসা।

'মেসেজটা হ্যারিকিরিই লিখেছে ঃ আজ মুক্তো নেই,' এক আঙুল তুলল কিশোর। দুই আঙুল তুলে বলল, 'লিট্‌ল্ টোকিওর হ্যারিকিরির বাড়িতেই গিয়েছিল রিচার্ড হ্যারিস।' তিন আঙুল তুলল, 'আর স্ন্যাকস রেস্টুরেন্টে হ্যারিকিরির জন্যেই অপেক্ষা করছিল ব্লিংকি।'

'হুঁ,' মাথা দোলাল মুসা, 'পরিষ্কার হচ্ছে।'

'রবিনের সৌজন্যে জেনেছি, কেন অপেক্ষা করছিল ব্লিংকি, আর কেনই বা ছুটে গিয়েছিল সবুজ ভ্যানকে অনুসরণ করার জন্যে।'

'আমার সৌজন্যে?' ভুরু কোঁচকাল রবিন।

'হ্যাঁ, তাই তো। তুমিই তো দেখে এসেছ, হ্যারিকিরির ডাকবাক্সে নতুন রঙ করা হয়েছে, তারমানে নতুন বাড়ি বদলেছে জাপানীটা। এটাই জানতে চেয়েছিল ব্লিংকি কোথায় নতুন বাড়ি নিয়েছে হ্যারিকিরি।'

'কেন?'

'সেটাই জানতে হবে আমাদের। হ্যারিকিরির সঙ্গে ব্লিংকির কি সম্পর্ক, আর মুক্তোরই বা কি সম্পর্ক।'

এক মুহূর্ত চুপ থেকে বলল কিশোর, 'সবুজ ভ্যানটাকে আবার অনুসরণ করতে হবে আমাদের। জানার এটাই একমাত্র উপায়।'

'বীপার তো লাগানোই আছে,' বলল মুসা।

মাথা নাড়ল কিশোর। 'ওটা দিয়ে আর কাজ হবে না। নিশ্চয় এতক্ষণে ব্যাটারি ফুরিয়ে গেছে। হ্যারিকিরির বাড়ি গিয়ে ব্যাটারি বদলে দিয়ে আসা খুব ঝুঁকির ব্যাপার।'

'তাহলে?'

'কাজটা তোমাকেই করতে হবে, মুসা,' গোয়েন্দা-সহকারীর দিকে তাকাল কিশোর।

ফোঁস করে দীর্ঘশ্বাস ফেলল মুসা। দু-হাত নেড়ে বলল, 'হ্যাঁ, এই ভয়ই করছিলাম। কপালই খারাপ। যত কঠিন আর ঝুঁকির কাজ, সব এই মুসা আমানের ঘাড়ে। কি আর করব, মাথায় তো আমারই সইবে...,' চোখ নাচিয়ে জিজ্ঞেস করল, 'তা জনাব, কাজটা কি?'

'নিষ্ঠুর!' চেঁচিয়ে উঠল তোতা। 'নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর!'

'দূর ব্যাটা!' তিক্ত কণ্ঠে বলল মুসা। 'চুপ থাক!'

তোতাটাও বলল, 'দূর ব্যাটা! চুপ থাক!'

# দশ

পরদিন খুব ভোরে অন্ধকার থাকতেই উঠে পড়ল মুসা। তাড়াতাড়ি হাতমুখ ধুয়ে জীনসের প্যান্ট পরে নিল। ধূসর সোয়েটার গায়ে দিল। তারপর স্নীকার পায়ে দিয়ে পা টিপে টিপে নেমে এল নিচে, রান্নাঘরে, যা-ই পাওয়া যায় কিছু মুখে দিয়ে

বেরোবে।

রান্নাঘরের টেবিলে পড়ে আছে একটা কালো সানগ্লাস, গতরাতে নিশ্চয় তার বাবা ফেলে গেছেন। চশমাটা নেবে কি নেবে না ভাবতে ভাবতেই গিয়ে ফ্রিজ খুলল। ঠাণ্ডা কেক ছাড়া আর কিছু নেই, তা-ই বের করে নিল গোটা দুয়েক, তারপর একটা গ্লাসে দুধ ঢেলে নিয়ে এসে বসল টেবিলে।

চশমা পরলে কি তার চেহারা বদলে যাবে? তাকে দেখলে তখন চিনতে পারবে হ্যারিকিরি?

চশমাটা নেবে ঠিক করল মুসা। দরকার হলে পরতে পারবে। খাপসুদ্ধ চশমাটা নিয়ে বেরিয়ে এল সে। ছাউনির তলায় রাখা আছে দুটো সাইকেল। তার মধ্যে একটা দশ গীয়ারের ইংলিশ রেসার, মুসার খুব প্রিয়, গত জন্মদিনে বাবা উপহার দিয়েছেন। সাইকেলটাকে খুব যত্ন করে সে। পুরানো সাধারণ সাইকেলটা সব সময় ব্যবহার করে, অন্যটা বের করে বিশেষ দরকার পড়লে। ঘণ্টায় তিরিশ মাইল গতিতে সহজেই চলতে পারে ইংলিশ রেসার, সর্বোচ্চ গতিবেগ ঘণ্টায় চল্লিশ।

আদর করে সাইকেলটার গায়ে চাপড় দিল মুসা, ঘোড়াপ্রেমিক যেমন তার প্রিয় ঘোড়ার গায়ে চাপড় দেয়। ছাউনি থেকে বের করে চড়ে বসল।

দশ মিনিটেই পৌঁছে গেল লিটল্ টোকিওর সীমান্তে। রাস্তার ধারে গাছপালার আড়ালে সাইকেলটা পার্ক করে একটা শেকড়ে বসল সে, চোখ রাখল হ্যারিকিরির বাড়ির দিকে।

ঠিক সময়েই এসেছে মনে হচ্ছে। গাড়িবারান্দায় দাঁড়িয়ে আছে সবুজ ভ্যান, পোর্টিকোর আলো জ্বলছে।

পুব পাহাড়ের মাথায় সবে উঁকি দিয়েছে সূর্য, এই সময় নীল একটা সেডান এসে থামল বাড়ির সামনে। একজন লোক নেমে হেঁটে গেল গাড়িবারান্দার দিকে। কালো কোট, ডোরাকাটা প্যান্ট, মুখভর্তি দাড়িগোঁফ, লোকটা রিচার্ড হ্যারিস ছাড়া আর কেউ না, মুসা শিওর। আলো খুব স্পষ্ট নয়, কিন্তু এতবার এই পোশাকে দেখেছে লোকটাকে, ভুল হতে পারে না তার।

কালো চশমা পরেনি হ্যারিস, হাতে একটা বাক্সমত জিনিস, সম্ভবত খবরের কাগজে মোড়া। ভ্যানের পেছনের দরজা খুলে প্যাকেটটা ভেতরে রাখল সে।

পোর্টিকোর আলো নিভে গেল।

ভ্যানের দরজা বন্ধ করে ফিরে এল হ্যারিস, সবুজ গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

আবার গাছে হেলান দিল মুসা। মিনিট দশেক পর হ্যারিকিরির বাড়ি থেকে একজন জাপানী বেরিয়ে সবুজ ভ্যানের দিকে এগোল।

রবিনের মতই দ্বিধায় পড়ল মুসা, কে লোকটা? হ্যারিকিরি না তার সঙ্গী দোভাষী সেই জাপানী?

মনে পড়ল, কিশোর বলেছে, দোভাষীর পরনে ছিল চওড়া বেল্ট, জীনসের প্যান্টে গ্রীজের দাগ। ভালমত দেখল মুসা, কিন্তু বেল্ট পরেনি এ-লোকটা, প্যান্টেও দাগ নেই। তারমানে, হ্যারিকিরি। মোটা সুতীর রঙ চটা পোশাক পরেছে, হাতে একটা ধাতব বাক্স, লাঞ্চ বক্স।

গাছের আড়াল থেকে সাইকেল বের করে পিছু নেয়ার জন্যে তৈরি হলো মুসা।

পেছনের দরজা খুলল না হ্যারিকিরি, এমনকি পেছনের জানালা দিয়ে ভেতরেও চেয়ে দেখল না। ড্রাইভিং সীটে উঠে এঞ্জিন স্টার্ট দিয়ে গাড়ি পিছিয়ে বের করে আনতে শুরু করল।

রাস্তায় সাইকেল নামাল মুসা।

গাড়ি পথের শেষ মাথায় এসে ডানে মোড় নিল ভ্যান, তারপর সোজা ছুটে এল মুসার দিকে। এটা আশা করেনি সে, তাড়াতাড়ি সাইকেল নিয়ে ঢুকে পড়ল আবার গাছের আড়ালে।

সাঁ করে ছুটে চলে গেল ভ্যান।

আস্তে আস্তে দশ পর্যন্ত গুণল মুসা, তারপর গাছের আড়াল থেকে বেরিয়ে পিছু নিল গাড়ির।

পাহাড়ী পথ ধরে শহরের দিকে ছুটে চলেছে ভ্যান, অনুসরণ করতে কোনই অসুবিধে হলো না মুসার। মেইন স্ট্রীটে পড়ে আরও সুবিধে হয়ে গেল, একটা নির্দিষ্ট দূরত্ব বজায় রেখে পিছে পিছে চলল সে।

কোস্ট রোডের দিকে মোড় নিল ভ্যান। গতি বাড়ছে ওটার, মুসাও বাড়াচ্ছে সাইকেলটার গতি এভাবে পরীক্ষা করে দেখার সুযোগ হয়নি আগে, খুশিই হলো সে, গাড়ির একশো গজ পেছনে থেকে প্যাডাল ঘুরিয়ে চলেছে দ্রুত, আরও দ্রুত।

স্ন্যাকস রেস্টুরেন্টকে যখন পাশ বাড়াচ্ছে···তিরিশ···পঁয়তিরিশ···চল্লিশ, টপ গীয়ারে চলছে এখন সাইকেল।

কয়েক মিনিট পর উইলস বীচ পেরোল ওরা। এখানকার সৈকতে ক্যাম্প করার অনুমতি আছে, তবে আগুন জ্বালানো নিষিদ্ধ। ঝকঝকে বালিতে কয়েকটা তাঁবু খাটানো। একটা তাঁবু থেকে একটা মেয়ে বেরিয়ে এল। মুসার দিকে হাত নাড়ল। কি ব্যাপার? পরিচিত কেউ নাকি? কিন্তু ভালমত খেয়াল করার সময় এখন নেই তার।

উইলস বীচের মাইল দুয়েক দূরে সাগরের দিকে মোড় নিয়েছে রাস্তাটা। দূরে সাগরের দিকে তাকাল সে তৃষিত নয়নে। বড় বড় ঢেউ ভাঙছে। গিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়ার ইচ্ছেটা অনেক কষ্টে রোধ করল।

চোখ ফিরিয়েই চমকে গেল। সহসা ব্রেক চেপে ধরায় তীব্র প্রতিবাদের ঝড় তুলল সাইকেলের টায়ার, কর্কশ আর্তনাদ করে পিছলে গেল কয়েক গজ, ঝাঁকুনি দিয়ে থেমে দাঁড়াল।

ভ্যানের পেছনের লাল লাইট জ্বলছে আর নিভছে, হুঁশিয়ার করে দিচ্ছে পেছনের যানবাহনকে।

হ্যান্ডেল চেপে ধরে সীটেই বসে রইল মুসা। সামনে থেমে গেল ভ্যান। মনে পড়ল, হ্যারিকিরির সদাসতর্ক দৃষ্টির কথা। জাপানীরাই কারাতে নামক ভয়ঙ্কর 'মারপিটের' আবিষ্কর্তা, কথাটা মনে হতেই মুখ ফ্যাকাসে হয়ে গেল তার। তৈরি হয়ে গেল পালানোর জন্যে। একটু এদিক ওদিক দেখলেই ছুটে পালাবে। লজ্জা কিসের, কেউ যদি না দেখল? এখানে তার বন্ধুরা কেউ নেই, টিটকারি মারার মত

শক্রও নেই। শুঁটকি টেরির কথা মনে পড়ল হঠাৎ করেই। সেই যে করে নিউ ইয়র্ক গেছে টেরিয়ার ডয়েল, আর দেখা নেই, ফেরেনি রকি বীচে। কড়া শাসনে রেখেছে বোধহয় তার বাবা। শুঁটকিকে পছন্দ করে না তিন গোয়েন্দা, কিন্তু ও না থাকলে জমেও না।

চলতে শুরু করেছে সবুজ ভ্যান। ধীরে ধীরে এগিয়েই মোড় নিল বাঁয়ে।

সাগরের দিকে চলে গেছে একটা সরু পথ, এতক্ষণ দেখেনি মুসা, খেয়ালই করেনি। সাবধানে প্যাডাল ঘোরাল সে। থেমে গেল মোড়ে এসে। গজ তিরিশেক দূরে একটা পার্কিং লটে গিয়ে শেষ হয়েছে সরু পথ। তারপরে মোটা কাঁটাতারের বেড়া, গেট। তার ওপাশে কাঠের একগুচ্ছ কুঁড়ে।

পার্কিং লটে থামল সবুজ ভ্যান।

বড় রাস্তার ধারে বনতুলসীর ঝাড় ঘন হয়ে জন্মেছে, সাইকেলটা তার মধ্যে শুইয়ে নিজেও ঝাড়ের ভেতর উপুড় হয়ে শুয়ে পড়ল মুসা। দেখল, ভ্যান থেকে নেমে লাঞ্চ বক্স হাতে গাড়ির পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়েছে হ্যারিকিরি, দরজা খুলে ভেতরে ঢুকল। বন্ধ করে দিল আবার দরজা।

ব্যাপার কি, বেরোচ্ছে না কেন লোকটা? এত দেরি? করছে কি ভেতরে? কাপড় বদলাচ্ছে?

না বদলায়নি, আগের পোশাকেই বেরিয়ে এল হ্যারিকিরি। হাতে লাঞ্চ বক্স। দু-হাতে ধরে সেটা সামনে বাড়িয়ে রেখে এগোল গেটের দিকে।

কাঠের একটা কুঁড়ে থেকে বেরিয়ে এল একজন লোক, পরনে খাকি ইউনিফর্ম। পুলিশ নয়, সিকিউরিটি গার্ড গোছের কিছু হবে, আন্দাজ করল মুসা। কাঁটাতারের পাল্লা খুলে দিল গার্ড, ভেতরে ঢুকল হ্যারিকিরি। আবার পাল্লা লাগিয়ে তালা আটকে দিল গার্ড।

গাড়ির শব্দে ফিরে তাকাল মুসা, বড় রাস্তা ধরে ছুটে আসছে একটা পিকআপ। আরও ঘন ঝোপের ভেতরে ঢুকে গেল সে, যাতে গাড়ির লোকের চোখে না পড়ে। মোড় নিয়ে সরু রাস্তায় নেমে কাঁটাতারের বেড়ার দিকে এগুলো পিকআপটা। পার্কিং লটে থামল। সামনে থেকে নামল দুজন, পেছন থেকে দুজন, চারজনই জাপানী। সবার হাতেই একটা করে লাঞ্চবক্স। এগিয়ে গেল গেটের দিকে।

তালা খুলে চারজনকেই ভেতরে ঢুকতে দিল গার্ড।

কি ধরনের এলাকা এটা?—অবাক লাগছে মুসার। এত কড়াকড়ি কেন? কয়েকটা কাঠের কুঁড়ে ছাড়া আর তেমন কিছু তো চোখে পড়ছে না। কুঁড়েগুলোর পরে বেশ অনেকখানি ছড়ানো সমভূমি সাগরে গিয়ে মিশেছে। কোন গাছপালাও দেখা যাচ্ছে না ওখানে।

আরে না, সমভূমি তো নয়, ভালমত লক্ষ্য করতেই বুঝল মুসা। বিশাল এক কৃত্রিম হ্রদ, খুদে উপসাগরও বলা চলে। খাল কেটে সাগরের পানি ঢোকার ব্যবস্থা হয়েছে, খালে পাথরের নিচু বাঁধ। হ্রদের পানির কয়েক ইঞ্চি ওপরে কাঠের অনেকগুলো সাঁকো, একটার ওপর আরেকটা আড়াআড়ি ফেলে তৈরি হয়েছে অগুণতি চারকোণা খোপ, অনেক ওপর থেকে দেখলে মনে হবে চেককাটা বিছানার

চাদরের মত।

ওই সাঁকোতে উঠল গিয়ে জাপানীরা, একেকজন একেকদিকে ছড়িয়ে পড়ল। খোপের কিনারে উবু হয়ে বসে টেনে তুলল দড়িতে বাঁধা খাঁচা, একের পর এক। খাঁচায় কি আছে, দেখতে পাচ্ছে না মুসা, তবে জাপানীরা যে গভীর আগ্রহে দেখছে, এটা বোঝা যাচ্ছে। খাঁচার ভেতর থেকে কিছু বের করছে ওরা, তারপর কিছু একটা করছে।

হ্যারিকিরিকে চেনা যাচ্ছে না এখান থেকে, তবে ওই পাঁচজনেরই কোন একজন সে, তাতে সন্দেহ নেই।

আধ ঘন্টা ঝোপের ভেতর পড়ে রইল মুসা, কিছুই ঘটল না। কিছুই বদলাল না। বেড়ার ভেতরে তিনজন গার্ড দেখা যাচ্ছে, টহল দিচ্ছে। জাপানীরা তাদের খাঁচা নিয়ে ব্যস্ত। খানিক পর পর একটা করে খাঁচা নামিয়ে দিয়ে নতুন আরেকটা টেনে তুলছে।

ওদের মাথার ওপর ঘনঘন চক্কর দিচ্ছে সীগাল আর পায়রার ঝাঁক। এটা স্বাভাবিক দৃশ্য। এদিককার উপকূলে ওই পাখি না থাকাটাই বরং অস্বাভাবিক।

আর অপেক্ষা করে লাভ নেই, কিশোরকে জানানো দরকার। আসার সময় দেখেছে, মাইল খানেক দূরে একটা পেট্রল স্টেশন আছে। ঝোপ থেকে সাইকেল বের করে চড়ে বসল মুসা।

একবার বাজতেই ওপাশ থেকে রিসিভার তুলল কিশোর। খুলে বলল সব মুসা। জানাল, এখন উইলস বীচের মাইলখানেক দূরে রয়েছে। কিশোর আর রবিনের জন্যে এখানেই অপেক্ষা করবে সে।

'সাইকেলটা দারুণ।'

উচ্ছ্বসিত প্রশংসা শুনে ফিরে চাইল মুসা। তার চেয়ে বছর দুয়েকের বড় একটা ছেলে চকচকে চোখে দেখছে ইংলিশ রেসারটাকে। স্টেশনেরই কর্মচারী।

ধন্যবাদ জানাল মুসা।

পাশে বসে পড়ল ছেলেটা। মুসার মতই সাইকেলের ভক্ত, বোঝা গেল কয়েকটা কথা বলেই। বেশ ভালই জমল ওদের আলোচনা। সাইকেল সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান ছেলেটার, বকবক করে চলল একনাগাড়ে।

এক সময় মুসার মনে হলো, তাই তো, খালি সাইকেল কেন, আরও তো কিছু জানা যেতে পারে ছেলেটার কাছে? জিজ্ঞেস করতে দোষ কি?

'আচ্ছা,' মুসা বলল, 'মেইন রোড থেকে একটা সরু পথ নেমে গেছে না সাগরের দিকে, এই তো মাইলখানেক দূরে, কাঁটাতারের বেড়া, গার্ড। ব্যাপারটা কি, বলো তো?'

'শুনেছি, ঝিনুকের খামার। কয়েক বছর আগে এক ধনী জাপানী করেছে ওটা। বিরাট দীঘি খুঁড়ে তাতে সাগরের পানি ঢোকার ব্যবস্থা করেছে। ওখানে নাকি ঝিনুকের চাষ করে।'

আর কিছু জানা গেল না ছেলেটার কাছে, জানে কিনা জিজ্ঞেস করার সুযোগও অবশ্য হলো না মুসার। গাড়ির ভিড় বেড়েছে, পেট্রল নিতে ঢুকছে, সবারই তাড়া।

দিতে একটু দেরি হলেই রেগে যাচ্ছে। হাত থেকে পাম্প রাখারই সময় পাচ্ছে না ছেলেটা।

কিশোর আর রবিন পৌঁছে গেল। পরিশ্রমে লাল দুজনের মুখ, ঘামছে, হাঁপাচ্ছে। আরও দুটো কোকাকোলার টিন আনতে গেল মুসা, ইতিমধ্যে ফোয়ারার পানিতে হাত-মুখ-মাথা ভিজিয়ে নিল কিশোর। তিনজনেই গিয়ে বসল আবার ছায়ায়। পেট্রল স্টেশনের ছেলেটাকে জিজ্ঞেস করে যা জানা গেছে, কিশোরকে জানাল মুসা।

'ঝিনুকের খামার,' চিন্তিত ভঙ্গিতে বলল কিশোর। 'সিকিউরিটি গার্ড। রিচার্ড হ্যারিস। বাদামী কাগজে মোড়া বড় প্যাকেট। কাজের কাজ করেছ, মুসা।'

'তাই নাকি? তা কি করেছি বলো না শুনি। আমি তো ছাই কিছুই বুঝতে পারছি না।'

জবাব দিল না গোয়েন্দাপ্রধান। উঠে দাঁড়াল। 'চলো, যাই। লুকানোর ভাল একটা জায়গা খুঁজে বের করতে হবে। ওরা কি করে দেখব।'

এক সারিতে সাইকেল চালাল তিন গোয়েন্দা।

কয়েক মিনিট পরে পৌঁছে গেল সরু রাস্তা আর বড় রাস্তার মিলনস্থলে। এমন একটা জায়গা খুঁজে বের করল যেখানে তুলসীর ঝাড়ে লুকিয়ে থেকে সরু পথ, বড় রাস্তা আর ঝিনুকের খামারের ওপর এক সঙ্গে চোখ রাখা যায়।

বিনকিউলার নিয়ে খানিকক্ষণ দেখে বলল কিশোর। 'তারের বেড়ার জন্যে স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না। ঝিনুক নিয়ে ওরা কি করছে বোঝা যায় না। ঝিনুকগুলো খুলছে মনে হচ্ছে।'

অনেক ওপরে উঠেছে সূর্য, কড়া রোদ। পেট্রল স্টেশন থেকে আরও কয়েক টিন কোকাকোলা নিয়ে আসা উচিত ছিল, ভাবল মুসা। সানগ্লাস বের করে চোখে লাগাল। তারপর চোখ বন্ধ করে শুয়ে পড়ল ছায়া ছায়া ঝাড়ের ভেতরে। কালো কাচের জন্যে আলো কম লাগছে চোখে।

দুপুরের দিকে গার্ডের বাঁশি বাজল। শ্রমিকদের খাবার সময়। সাঁকোতে রোদে বসেই টিফিন বাক্স থেকে খাবার বের করে খেতে শুরু করল ওরা।

মাথার ওপর, আশেপাশে কবুতর আর সীগালের ভিড় জমে গেল, খাবারের উচ্ছিষ্টের লোভে। হেই, যাহ্, হুস্‌স্‌ এমনি নানারকম শব্দ করে ওগুলোকে দূরে রাখার চেষ্টা করল শ্রমিকেরা। অবশেষে খাওয়ার আশা ছেড়ে একে একে উড়ে চলে গেল বেশির ভাগ পাখি।

বিনকিউলার চোখ থেকে নামাল কিশোর। জাপানীদের খেতে দেখে তারও খিদে লেগে গেল। জোর করে খাওয়ার ভাবনা দূর করে রহস্য সমাধানে মনোনিবেশের চেষ্টা চালাল সে। আনমনে চিমটি কাটতে শুরু করল নিচের ঠোঁটে।

ধূসর কাগজে মোড়া প্যাকেটটা ভ্যানের পেছনে রাখল হ্যারিস। কি ছিল তাতে মুসা দেখেছে, প্যাকেটটা গাড়িতে রেখে শুধু লাঞ্চ বক্স হাতে নিয়ে বেড়ার ভেতরে ঢুকেছে হ্যারিকিরি।

মুসার গায়ে ঠেলা দিল কিশোর। 'হ্যারিকিরি ভ্যানের পেছনের দরজায় তালা

লাগিয়েছে?'

মাথা তুলল মুসা। 'না,' ঘুম জড়ানো কণ্ঠ, 'লাগায়নি। কেন?' জবাবের অপেক্ষা না করেই আবার শুয়ে পড়ল।

যাবে নাকি, ভাবল কিশোর, গিয়ে দেখবে প্যাকেটটায় কি আছে? সঙ্গে সঙ্গেই বাতিল করে দিল ভাবনাটা। শ্রমিকেরা খেতে বসেছে বটে, কিন্তু গার্ডরা সতর্ক। গেটের কাছে রয়েছে একজন সারাক্ষণই।

কয়েক মিনিট পর আবার বাঁশি বাজল। টিফিন বাক্স রেখে আবার কাজে লাগল শ্রমিকেরা।

চোখ খোলা রাখার যথেষ্ট চেষ্টা করল কিশোর, পারল না। কোন কিছুই আর দেখার নেই, বিনকিউলারের ভেতর দিয়েও না। স্তব্ধ গরম, নীরবতা, ক্ষুধা সব কিছু মিলিয়ে তালগোল পাকিয়ে ফেলছে যেন, চোখ খোলা রাখতে পারছে না কিছুতেই। অবশেষে মুসার পাশেই গড়িয়ে পড়ল সে।

স্বপ্ন দেখছে কিশোর, আপেলের হালুয়া খাচ্ছে, তাতে প্রচুর কাঁচা মাখন মেশানো। এক চামচ খেয়ে আরেক চামচ তুলে নিতে গেল...

বাঁশির তীক্ষ্ণ শব্দে ঘুম ভেঙে গেল তার। ঘড়ি দেখল, তিনটে বাজে। জাপানীরা খাঁচাগুলো নামিয়ে রাখছে পানিতে।

আজকের মত ছুটি। গেটের দিকে এগোল শ্রমিকেরা।

ঘুমিয়ে নেয়ায় মাথা একদম পরিষ্কার হয়ে গেছে কিশোরের। তাই বোধহয় মুসার কালো চশমার দিকে চেয়ে চকিতে মনে পড়ে গেল কথাটা। মিস কারমাইকেলের বাগানে আর ট্রাসটি ব্যাঙ্কের পার্কিং লটে সানগ্লাস পরেছিল রিচার্ড হ্যারিস। দুবারই রাতে। কালো কাচ শুধু আলোই ঠেকায় না, চোখও ঢেকে রাখে অন্যের নজর থেকে। এই তো, এত কাছে থেকেও মুসার চোখ দেখতে পাচ্ছে না সে। বুঝতে পারছে না, খোলা না বন্ধ।

তারের বেড়ার দিকে তাকাল কিশোর। গেটের কাছে আসেনি জাপানী শ্রমিকেরা, একটা কুঁড়েতে ঢুকেছে। গার্ডদেরও কেউ বাইরে নেই, ওরাও ঢুকেছে শ্রমিকদের সঙ্গে।

এক লাফে উঠে দাঁড়াল সে। ছুটল সরু পথ ধরে পার্কিং লটের দিকে।

চোখ মেলল রবিন। পাশে কেউ নেই। কিশোর গেল কোথায়? পার্কিং লটের দিকে তাকাতেই দেখতে পেল সবুজ ভ্যানের পেছনের দরজা খুলে ঢুকে যাচ্ছে গোয়েন্দাপ্রধান। বন্ধ হয়ে গেল আবার দরজা।

'ইয়াল্লা!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা। 'করছে কি?'

'চুপ!' হুঁশিয়ার করল রবিন। 'আমরা এখন কি করি?'

কিছু তো বলে গেল না। তোমার কি মনে হয়? হ্যারিকিরির গাড়িতে লুকিয়ে কোথাও যাওয়ার ইচ্ছে?'

'জানি না,' মাথা নাড়ল মুসা। 'কিন্তু আমাদের কিছু করতে হবে মনে করলে বলেই যেত। নাকি?'

'তা ঠিক। ভ্যানটা খুঁজে দেখতে গেল না তো? দেখি, কি করে? হ্যারিকিরির

হাতে ধরা না পড়লেই হয়...' কিশোরের ফেলে যাওয়া বিনকিউলারটা তুলে নিল রবিন। সাঁকো, বেড়ার আশপাশ আঁতিপাতি করে খুঁজল। নির্জন একটা কুঁড়ের জানালায় চোখ পড়তেই থেমে গেল হাত।

স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে না, তবে বোঝা গেল ঘরটাতে শ্রমিক আর গার্ডে গিজগিজ করছে। শ্রমিকেরা সব কাপড় খুলে ফেলেছে। মনে হচ্ছে তল্লাশি চালাচ্ছে গার্ডেরা, শ্রমিকদের কাপড়-চোপড় খুঁজছে, লাঞ্চ বাক্সের ভেতরে দেখছে।

বিনকিউলার নামাল রবিন। দৌড়ে আসছে কিশোর। ধপাস করে এসে বসে পড়ল পাশে। মুখ লাল, জোরে জোরে হাঁপাচ্ছে। চোখে উত্তেজনা।

জিরিয়ে নিয়ে বলল, 'গার্ডরা ওদের সার্চ করছে, না?'

'তাই তো মনে হলো,' মাথা ঝাঁকাল রবিন। 'তুমি জানলে কি করে? কি খুঁজছে ওরা?'

'দেখে এসেছি,' প্রশ্নটা এড়িয়ে গেল কিশোর, 'প্যাকেটে কি আছে। মুসা, আলো তখন কম ছিল তো, বুঝতে পারোনি। ধূসর জিনিসটা খবরের কাগজ নয়, চীজক্লথ।'

'চীজক্লথ,' হাঁ হয়ে গেছে মুসা। 'মানে, ব্লিংকির প্যাকেটটার মত?'

'অবিকল এক জিনিস। ছেঁড়া খাঁচাটা পড়ে আছে। খালি। তবে বাজি রেখে বলতে পারি, সকালে রিচার্ড হ্যারিস যখন রেখে গেছিল, তখন খালি ছিল না। কারণ, এই জিনিস পেয়েছি ভেতরে,' মুঠো খুলে দেখাল কিশোর, কি পেয়েছে।

'পায়রা,' চোখ ছোট হয়ে গেছে মুসার। 'খাঁচার মধ্যে কবুতর ছিল...'

'এবং সেটাকে লাঞ্চ বক্সে ভরে গেট পার করে নিয়ে গেছে। দারুণ ফন্দি। ঢোকার সময় শ্রমিকদের টিফিন বক্স পরীক্ষা করে না গার্ডরা, বেরোনোর সময় করে।'

ভুরু কাছাকাছি হয়ে গেছে রবিনের। 'কেন করে? কি খোঁজে?'

'মুক্তো,' শান্তকণ্ঠে বোমাটা ফাটাল কিশোর।

## এগারো

'মুক্তো,' আবার বলল কিশোর। 'মুক্তো এবং রেসিং হোমার কবুতর।'

হেডকোয়ার্টারে আলোচনায় বসেছে তিন গোয়েন্দা। বিকেলে অসময়ে ফিরে এসে মেরিচাচীর বকাঝকা আর তাঁর হাতে তৈরি অনেকগুলো স্যাণ্ডউইচ খেয়ে পেট ভরেছে মুসা আর কিশোর।

দুধের গেলাসটা হাতে নিয়ে গিয়ে ফ্রিজ খুলেছে কিশোর, হতাশা চেপে রাখতে পারেনি, মুখ দিয়ে বেরিয়েই গেছে, 'দূর, নেই।'

'এই, কি নেই রে?' কাছেই বসা ছিল চাচী।

'আপেলের হালুয়া। বেশি করে কাঁচা মাখন দেয়া।'

'হঠাৎ করে হালুয়া খাওয়ার শখ হলো কেন? অন্য সময় তো সাধাসাধি করেও গেলাতে পারি না।'

'দুপুরে স্বপ্নে খেলাম তো, তখন থেকেই খেতে ইচ্ছে করছে।'

'স্বপ্ন দেখলি? কোথায় ঘুমিয়েছিলি?' উঠে দাঁড়াচ্ছেন মেরিচাচী।

চুপ হয়ে গেল কিশোর। অনেক বেশি বলে ফেলেছে।

'তুলসীবনে, চাচী, বেজায় ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম,' ঢাকতে গিয়ে আরও ফাঁস করে দিল মুসা।

প্রমাদ গুণল কিশোর, তাড়াতাড়ি বলল, 'ওই পাহাড়ের ধারে, চাচী তুলসী গাছ ছিল কাছে, তার ছায়ায়। সাইকেল চালাতে চালাতে ক্লান্ত হয়ে জিরোতে বসেছিলাম, কখন যে তন্দ্রা এসে গেল···হি-হি···তো চাচী, হালুয়া···'

'কোথায় যে কবে মরে পড়ে থাকবি,' চাচীর মুখের মেঘ সরছে না। 'এই, তুলসীবন থেকে যদি সাপ বেরোত? যদি···'

'দূর, চাচী, তুমি কিছু জানো না,' হাত তুলল কিশোর। 'তুলসীবনে সাপ থাকে না।'

'তবে কি থাকে?'

'কিছুই থাকে না। হ্যাঁ, চাচী, হালুয়া···আপেল আছে তো, নাকি বাজার থেকে এনে দেব?'

'আছে আছে, রাতে খাস, বানিয়ে রাখব। তবে কথা দিতে হবে, তুলসীবনে···'

'ঠিক আছে, চাচী, আর যাব না, যাও,' এক চুমুকে বাকি দুধটুকু খেয়ে মুসার হাত ধরে টেনে নিয়ে বেরিয়ে এসেছে কিশোর, চাচী আর কিছু বলার আগেই। সোজা এসে ঢুকেছে দুজনে হেডকোয়ার্টারে।

রবিন পরে এসেছে। কিশোরের অনুরোধে লাইব্রেরিতে গিয়েছিল দুটো বই আনতে,পথে রেস্টুরেন্টে খেয়ে এসেছে।

'হ্যাঁ,' রবিনের দিকে ফিরে জিজ্ঞেস করল কিশোর, 'মুক্তো চাষের ব্যাপারে কি লিখেছে বইতে?'

মূল্যবান পাথরের ওপর লেখা বইটা খুলল রবিন। ভেতরে এক পাতা আলগা কাগজ, তাতে নোট লিখেছে সে। 'হ্যাঁ, মুক্তোর চাষ।···স্প্যাট, মানে শিশু ঝিনুক জোগাড় করে খাঁচায় ভরে পানিতে ডুবিয়ে রেখে দেয়া হয়। ওগুলোর বয়েস যখন তিন বছর হয়, তুলে ফাঁক করে ভাঙা এক কণা মুক্তো ফেলা হয় ভেতরে। তারপর ঝিনুকগুলোকে আবার খাঁচায় ভরে ডুবিয়ে রাখা হয় পানিতে। শক্ত পাথর অস্ত্রের কাছের বিশেষ থলিতে আটকে খুব যন্ত্রণা দেয় ঝিনুককে, আপনা আপনি এক ধরনের রস বেরিয়ে তখন লাগতে থাকে কণাটার সঙ্গে, শক্ত হয়ে জমতে থাকে। এভাবেই ধীরে ধীরে বড় হতে থাকে কণাটা, পূর্ণাঙ্গ মুক্তোয় রূপ নেয় এক সময়। তিন থেকে ছয় বছর লাগে একটা মুক্তো তৈরি হতে।'

'কণাটার চারপাশে ব্যাণ্ডেজের মত জড়িয়ে যায় রস, না?' মুসা বলল। 'খুব নিষ্ঠুর মনে হচ্ছে। বছরের পর বছর প্রাণীগুলোকে এভাবে জ্যান্ত রেখে কষ্ট দেয়া···'

'মানুষের কাজই তো এরকম। ওই যে, জোর যার মুল্লুক তার। হ্যাঁ,' আবার নোট পড়ায় মন দিল রবিন। 'মুক্তো বড় হলে ঝিনুকের ভেতর থেকে বের করে নিয়ে পাঠানো হয় বাজারে। কালচার্ড মুক্তোর ব্যবসা জাপানেই বেশি, বড় বড় ফার্ম গড়ে

উঠেছে। কালচার্ড হলে কি হবে, দাম কম না, কোন কোনটা কয়েকশো ডলারও ওঠে।'

'আচ্ছা, কালচার্ড বলে কেন এগুলোকে?' জিজ্ঞেস না করে পারল না মুসা। 'সভ্য কিংবা সাংস্কৃতিমনা ঝিনুকের ভেতরে জন্মায়?'

মুসার মোটা বুদ্ধি দেখে হতাশ ভঙ্গিতে ঠোঁট ওল্টালো কিশোর।

'না না,' অধৈর্য হলো না রবিন। 'কৃত্রিম বলে এই নাম রাখা হয়েছে।'

'অ,' মাথা দোলাল মুসা, 'মুক্তোর ফার্মেই কাজ করে তাহলে হ্যারিকিরি,' পেছনে বাগবাকুম শুনে ফিরে দেখল, তার দিকেই চেয়ে আছে টম। জালের ফাঁক দিয়ে আঙুল ঢুকিয়ে পাখিটাকে আদর করল সে। 'এজন্যেই ওখানে গার্ডের এত কড়াকড়ি, মুক্তো যাতে চুরি হতে না পারে, তাই না, কিশোর?'

'তাই,' চেয়ারে হেলান দিল কিশোর। 'ঢোকার সময় শ্রমিকদের তল্লাশি করা হয় না। তাতেই আইডিয়াটা খেলেছে হ্যারিকিরি আর হ্যারিসের মাথায়। সহজ ফন্দি, মজাটাই ওখানে, বেশি সহজ হওয়াতেই ধোঁকা খাচ্ছে গার্ডেরা। খাঁচায় ভরে একটা রেসিং হোমারকে ভ্যানে রেখে দিয়ে আসে হ্যারিস। ফার্মে ঢোকার আগে খাঁচা থেকে পাখিটাকে বের করে লাঞ্চ বক্সে ভরে নেয় হ্যারিকিরি,' চুপ করল সে।

অপেক্ষা করছে অন্য দুজন।

'ঝিনুকে ভাল মুক্তো পেলে সেটা রেখে দেয় হ্যারিকিরি,' আবার বলল কিশোর, 'লাঞ্চের সময় বাক্স থেকে কবুতরটাকে বের করে তার পায়ে ঝিনুক বেঁধে দেয় কোনভাবে, হয়তো ছোট থলিটলিতে ভরে বা অন্য কোনভাবে। আশেপাশে এত পাখির ছড়াছড়ি, বিশেষ কবুতরটাকে খেয়ালই করে না গার্ডেরা। উড়ে সোজা বাড়ি চলে যায় ওটা, তখন খুলে নেয় রিচার্ড হ্যারিস।'

'বুঝলাম,' বলল রবিন, 'লাঞ্চের আগে ভাল মুক্তো পাওয়া না গেলে একটা মেসেজ বেঁধে কবুতর ছেড়ে দেয় হ্যারিকিরি। জাপানী ভাষায় মেসেজটাতে লেখা থাকে, আজ মুক্তো নেই, যে রকম পেয়েছি আমরা দু-আঙুলা কবুতরটার পায়ে বাঁধা। কিন্তু,' থামল সে, কিছু একটা ভেবে অবাক হচ্ছে, খাপে খাপে মেলাতে পারছে না বোধহয়। আবার বলল, 'কিন্তু…'

'কিন্তু ওটা রিচার্ড হ্যারিসের নয়,' রবিনের কথাটা শেষ করল কিশোর, 'ব্লিংকির, এই তো? অন্তত স্ন্যাকস রেস্টুরেন্টে তার কাছে ছিল ওটা। খাঁচাটাও হ্যারিসের কবুতরের খাঁচার মত, একই ধরনের চীজক্লথে মোড়া,' হাত বাড়াল সে, 'দেখি,অন্য বইটা দাও।'

দ্বিতীয় যে বইটা লাইব্রেরি থেকে নিয়ে এসেছে রবিন ওটা আসলে ম্যাপ, দক্ষিণ ক্যালিফোর্নিয়ার রোড অ্যাটলাস। পাতা উল্টে স্মল-স্কেলের একটা ম্যাপ বের করল কিশোর, তাতে রকি বীচ আর সান্তা মনিকার বিভিন্ন পথ দেখানো রয়েছে। অন্য দুই গোয়েন্দাও প্রায় হুমড়ি খেয়ে পড়ল ম্যাপের ওপর।

'এই যে, এটা উইলস বীচ,' ম্যাপের এক জায়গায় আঙুল রাখল কিশোর। 'ঝিনুকের খামারটা হবে এখানে। আর রিচার্ড হ্যারিসের বাড়ি,' উপকূল বরাবর ধীরে ধীরে আঙুল সরাল কিশোর, রকি বীচে এসে থামল। 'এই যে, এখানে। ফোন

গাইডে তার ঠিকানা পেয়েছি। এটা হলোগে শহরের পশ্চিম সাইড।'

ড্রয়ার থেকে একটা রুলার বের করে ফার্ম আর রিচার্ডের বাড়ি, এই দুটো পয়েন্টের ওপর রাখল কিশোর, 'কি বোঝা যায়?'

'সরাসরি আকাশ পথ বেশির ভাগটাই সাগরের ওপর দিয়ে,' বলে উঠল মুসা। 'ফার্ম থেকে হ্যারিসের বাড়ি ছয় মাইল!'

'রেসিং হোমারের জন্যে বড় জোর ছয় মিনিটের পথ,' মুসার মুখের কথা কেড়ে নিয়ে বলল রবিন। 'দুপুরে বাড়ি গিয়ে হ্যারিসকে মোটেই অপেক্ষা করতে হয় না, মুক্তো কিংবা মেসেজ পেয়ে যায়।'

'কিন্তু তাহলে মিস কারমাইকেলের বাগানে কবুতর মরে কি করে, মানে রেসিং হোমারের লাশ পাওয়া যায় কিভাবে?' প্রশ্ন রাখল মুসা। 'তাঁর বাড়ি তো শহরের পুবধারে।' ম্যাপে আঙুল রাখল, 'এই যে, এখানে। রিচার্ডের বাড়ি থেকে অনেক দূরে। কোর্স থেকে এতখানি সরে গিয়েছিল দু-আঙুলা?'

'হ্যারিসের বাড়িতে যায় ভাবলে সেটা মনে হবে,' রুলার সরিয়ে ফার্ম আর মিস কারমাইকেলের বাড়ির ওপর রাখল কিশোর। 'কিন্তু যদি এখানে যায়?' ম্যাপের আরেক জায়গা নির্দেশ করল সে।

'সান্তা মনিকা,' বিড় বিড় করল রবিন।

'ব্লিংকির বাড়িতে?' মুসা বলল।

'হতে পারে,' রবিনের মনে পড়ল, 'ব্লিংকি বলেছিল সে সান্তা মনিকায় থাকে...'

'সুতরাং,' আগের কথার খেই ধরল কিশোর, 'দু-আঙুলার মালিক যদি ব্লিংকি হয়, আর বাড়ি যেতে চায় কবুতরটা তাহলে মিস কারমাইকেলের বাগানের ওপর দিয়ে যেতে হবে। ধরে নিতে অসুবিধে নেই, বাজের কবলে পড়েছে ওটা তখনই।' টেবিলে বার দুই টোকা দিল সে। 'আর, আমার মনে হয় দু-আঙুলাই প্রথম মারা পড়েনি, ব্লিংকির আরও কবুতর মারা পড়েছে মিস কারমাইকেলের বাগানে। মহিলা বলেছেন, এক মাসে তাঁকে তিনটে মুক্তো এনে দিয়েছিল হীরা। পেল কোথায় পাখিটা? নিশ্চয় বাগানে, মরা কবুতরের পায়ে বাঁধা, ঠুকরে ঠুকরে কোনভাবে খুলে নিয়ে গেছে মনিবকে উপহার দিতে।'

'মিলছে,' একমত হলো মুসা।

ম্যাপ বই বন্ধ করল কিশোর, ভুরু কোঁচকাল। 'মেলে, যদি হ্যারিস আর ব্লিংকি পার্টনার হয়। তাহলে একদিন হ্যারিসের কবুতর ব্যবহার করবে, আরেক দিন ব্লিংকির। আর তা হলেই শুধু হ্যারিসের আজব ব্যবহারের একটা অর্থ করা যায়। ব্লিংকির পাখি মারা পড়ায় পার্টনার হিসেবে সে-ও উদ্বিগ্ন হয়ে উঠেছিল, রাতের বেলা তদন্ত করতে গিয়েছিল মিস কারমাইকেলের বাগানে। আমাকে দেখে ভেবেছিল আমিই খুনী, তাই রাগ সামলাতে না পেরে বাড়ি মেরে বসেছে।'

মাথা নাড়ল সে, নিজের কথাই যেন বিশ্বাস করতে পারছে না। 'তারপর মিস কারমাইকেলের কাছে শুনল, আমরা তাঁকে সাহায্য করছি। তখন খাতির করার চেষ্টা করল আমাদের সঙ্গে। ডেকে নিয়ে গিয়ে খাওয়াল, পাখির খুনীকে ধরে দেয়ার জন্যে উৎসাহিত করল। ধরে নিতে হয়, সে চাইছিল, মিস কারমাইকেলের পাখি

খুনের তদন্ত করতে গিয়ে ব্লিংকির কবুতর কিভাবে মারা গেছে সেটা বের করি আমরা।' আবার মাথা নাড়ল সে। 'কিন্তু ব্লিংকি আর হ্যারিস বন্ধু হতে পারে না।'

'কেন?' সঙ্গে সঙ্গে কথাটা ধরল রবিন । 'পারে না কেন?'

ঠোঁট কামড়াল কিশোর। 'পারে না এই জন্যে, ব্লিংকি আর হ্যারিকিরিকেও তাহলে পার্টনার হতে হয়। তাহলে ব্লিংকির জানার কথা হ্যারিকিরির নতুন বাসার খবর। জানা থাকার কথা, হ্যারিকিরি নতুন বাড়ি নিয়েছে। স্ন্যাকস রেস্টুরেন্টে বসে থেকে অনুসরণ করার দরকার পড়ত না। সবুজ ভ্যানের পিছু নিয়ে গিয়ে লুকিয়ে দেখে আসার দরকার পড়ত না কোথায় বাড়ি নিয়েছে হ্যারিকিরি।'

উঠে দাঁড়াল কিশোর। 'বাড়ি যাও তোমরা। রাতে বাইরে কাটানোর অনুমতি নিয়ে এসো। দু-ঘন্টার মধ্যে ফিরে আসবে। স্লীপিং ব্যাগ নিয়ে আসবে সঙ্গে করে।'

'কেন?' রবিন আর মুসা, দুজনেই জানতে চাইল।

'কাল সকালে হ্যারিকিরির জন্যে তৈরি থাকতে পারব আমরা।'

'আবার কি করতে হবে,' প্রশ্ন করল মুসা। 'অনুসরণ?'

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'কেসটার সমাধান করব। খুব সহজ উপায়ে।' খাঁচার দিকে তাকাল সে। 'টমকে দিয়ে ফাঁদে ফেলব ব্লিংকিকে।'

# বারো

ব্যাগের ভেতরে নড়েচড়ে উঠল কিশোর। সারারাত খোলা আকাশের নিচে শক্ত মাটিতে পড়ে থেকে পিঠ ব্যথা হয়ে গেছে। দূর, সৈকত না কচু, বালি এত শক্ত! চোখ মিটমিট করল, পাতার ওপর থেকে ঝরে পড়ল কয়েক কণা বালি, বাতাসে উড়িয়ে এনে ফেলেছে। শুকনো ঠোঁট চাটতেই জিভের সঙ্গে মুখের ভেতরে চলে গেল ঠোঁটের বালি। বিরক্ত ভঙ্গিতে মুখ বাঁকাল।

ঘড়ি দেখল সে, ছটা বাজে। যাওয়ার সময় হয়েছে। হামাগুড়ি দিয়ে বেরিয়ে এল ব্যাগের ভেতর থেকে।

অন্য দুই গোয়েন্দা আগেই উঠেছে। টমকে দানা খাওয়াচ্ছে মুসা। রবিন নাস্তা সাজাচ্ছে। কয়েকটা কেক ও এক ব্যাগ দুধ ঠেলে দিল কিশোরের দিকে।

কেকে কামড় দিয়েই আবার মুখ বাঁকাল কিশোর। দাঁতে কিচকিচ করছে বালি। দুধের ব্যাগের কোণা ছিঁড়ে পাইপ ঢুকিয়ে চুমুক দিল, আস্তে আস্তে টেনে তুলে দুধ দিয়ে ধুয়ে ফেলল মুখের ভেতরটা, বালি সব পেটে চলে গেল। এইবার কেক খেতে আর কোন অসুবিধে নেই।

দশ মিনিটেই মালপত্র গুছিয়ে তৈরি হয়ে গেল ওরা। টমের খাঁচা চীজক্লথ দিয়ে মোড়াতে মুসাকে সাহায্য করল কিশোর। নিজের সাইকেলের ক্যারিয়ারে খাঁচাটা বেঁধে নিল সে। ক্যারিয়ারে মালপত্র বেঁধে নিল মুসা, হ্যাণ্ডেলে ঝুলিয়ে নিল প্ল্যাসটিকের একটা শপিং ব্যাগ।

রওনা হলো ওরা। মাইলখানেক দূরের পেট্রল স্টেশনে এসে থামল। সেই অ্যাটেনডেন্ট ছেলেটাই ডিউটিতে আছে, মালপত্রগুলো সেখানে রাখার অনুরোধ

জানাল মুসা। ঘণ্টা দুয়েকের জন্যে মাল পাহারা দিতে রাজি হলো ছেলেটা।

বেশির ভাগ মাল পেট্রল স্টেশনে রেখে আবার সাইকেলে চাপল তিন গোয়েন্দা। পাহাড়ী পথ ধরে উঠে গেল আধ মাইল, ঝিনুকের ফার্মের দিকে। আগের দিনেই সুবিধেমত একটা জায়গা বেছে রেখেছে কিশোর। বড় রাস্তাটা যেখানে মোড় নিয়েছে, তার পাশে ঘাসে ঢাকা চওড়া এক ফালি জমি আছে, তাতে তুলসী গাছের বড় বড় ঝোপঝাড়।

ঝোপের ভেতরে সাইকেল শুইয়ে রাখলে রাস্তা থেকে দেখা যাবে না। লুকিয়ে ফেলল মুসা আর রবিন। ক্যারিয়ার থেকে খাঁচাটা খুলে নিয়ে কিশোরও সাইকেল লুকাল। তিনজনে এসে বসল তুলসীবনে। সাইকেল পাম্প আছে সবার সাইকেলেই, খুলে নিয়েছে। মুসার হাত থেকে শপিং ব্যাগটা নিয়ে খুলল রবিন। মুঠো মুঠো বেলুন বের করে ভাগ করে দিতে লাগল। নানা আকারের উজ্জ্বল রঙের বেলুন—লাল, নীল, হলুদ, সবুজ। বেলুনের মুখ বেঁধে ফেলতে লাগল ওরা। দেখতে দেখতে পথের ধারে বেলুনের ছোটখাট একটা পাহাড় গড়ে উঠল।

খুব সকালে লোকজন বেরোয়নি, এতক্ষণে একটা গাড়িকেও যেতে দেখা যায়নি ওপথে। খুশিই হলো কিশোর, নিরাপদে কাজ করা যাচ্ছে। বাতাসও নেই আজ, ভালই হয়েছে, বেলুন উড়িয়ে নিচ্ছে না। দিনের শুরুটা বেশ ভালই।

ব্যাগ খুলে ভাঁজ করা এক টুকরো সাদা কাপড় বের করল রবিন। গতরাতে কিশোরের নির্দেশে তৈরি করেছে ব্যানারটা। ভাঁজ খুলে ছড়িয়ে লম্বা করে দুটো গাছের সঙ্গে কাপড়ের কোণগুলো বেঁধে দিল ওরা। লাল কালিতে বড় বড় করে লেখা হয়েছেঃ

**আমাদের ডানাওয়ালা বন্ধুদের**
**রক্ষা করুন**
**একটা বেলুন কিনুন**

পথের তীক্ষ্ণ মোড়ের গজ বিশেক দূরে তাকাল কিশোর, খুদে একটা পাহাড় আছে ওখানে, মেসকিট আর তুলসী গাছের ঝোপঝাড়ে ঢাকা।

'রবিন,' নির্দেশ দিল কিশোর, 'ওখানে গিয়ে লুকাও। আমার আর মুসার ওপর চোখ রাখতে পারবে। রুমাল আছে তোমার কাছে?'

'আছে,' জিনসের প্যান্টের পকেট থেকে রুমাল বের করল রবিন। 'মুসা, এভাবে নাড়ব, সামনে-পেছনে। তাহলে বুঝবে, কাজ হয়ে গেছে।'

নীরবে মাথা ঝুঁকিয়ে সায় জানাল মুসা। এসব ভাল লাগছে না তার। হ্যারিকিরিকে না রাগিয়ে পারবে তো কাজ সারতে? এখন তার মনে হচ্ছে, কারাতে ফাইটে নিশ্চয় ব্ল্যাক বেল্ট আছে জাপানীটার। যদি মুসাকে চিনে ফেলে, সঙ্গে সঙ্গে দু-হাত দিয়ে কোপাতে শুরু করবে।

বাবার কালো চশমাটা নিয়ে এসেছে মুসা, বের করে পরল। 'কি করে জানছি সে আসছে?' গলা কাঁপছে মৃদু।

'তিনবার শিস দিলে বুঝবে গাড়ি দেখা যাচ্ছে,' বলল কিশোর। 'আমাকে পেরিয়ে যাওয়ার পর আরও দুবার শিস দেব। ঠিক আছে?'

'ঠিক আছে।'

মুসার কণ্ঠে অনিশ্চয়তা বুঝতে পারল কিশোর। খারাপ লাগছে তার, সব চেয়ে কঠিন কাজটা করতে হচ্ছে মুসাকে। সে নিজে পারলে ভাল হত। কিন্তু অতিরিক্ত ঝুঁকি নেয়া হয়ে যাবে তাতে, সব কিছু ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা আছে। এতদূর এগিয়ে সব গণ্ডগোল করে দিতে চায় না। তাকে দেখলেই সঙ্গে সঙ্গে চিনে ফেলবে হ্যারিকিরি, ইয়ার্ডে তার সঙ্গেই কথা বলেছে।

'মুখ গোমড়া করে রেখেছ কেন?' বন্ধুকে ভরসা দিল কিশোর। 'হাসো, হাসি হাসি করে রাখো। কথা বলবে সহজ ভাবে। গোমড়ামুখ লোককে চাঁদা দেয় না কেউ।'

'কি বলব?'

'যা মুখে আসে। ব্যাটা ইংরিজি বোঝে না।'

'আচ্ছাহ্,' জোরে নিঃশ্বাস ফেলল মুসা।

ঘড়ি দেখল কিশোর। 'সময় হয়ে গেছে।'

ছোট পাহাড়টায় উঠে ঝোপের আড়ালে লুকিয়ে বসল রবিন।

কিশোর গিয়ে ঢুকল তুলসীবনে, সাইকেলগুলো যেখানে রেখেছে। মুসা যেখানে আছে জায়গাটা তার চেয়ে উঁচু। কবুতরের খাঁচাটায় হাত রেখে তৈরি হয়ে রইল।

বেলুনের পাহাড়ের পাশে ধপ করে বসে পড়ল মুসা, বিড়বিড় করল, 'আমাদের ডানাওয়ালা বন্ধুদের রক্ষা করুন। জাহান্নামে যাক ডানাওলারা···হুঁহ্! আমাকে রক্ষা করে কে?'

রোদ চড়েনি, আবহাওয়া ঠাণ্ডা, কিন্তু দরদর করে ঘামছে কিশোর। জুলফির কাছ থেকে ঘাম গড়িয়ে গাল বেয়ে এসে জমা হচ্ছে চিবুকে, সেখান থেকে টুপ করে পড়ছে তুলসী পাতায়। তুলসীর নেশা ধরানো গন্ধ ভোরের বাতাসে, কিন্তু উপভোগ করার সময় এখন নেই। মুসার জন্যে দুশ্চিন্তা হচ্ছে, ভাবছে আবল-তাবল, নিজেকে ধমক লাগাল সে। চোখ ফেরাল বাঁয়ে, পথের দিকে, যেখান দিয়ে আসবে সবুজ ভ্যানটা।

এক মিনিট গেল···পাঁচ মিনিট···দশ···আসবে তো? নাকি আজ হ্যারিকিরির ছুটি? কোথাও কোন কারণে আটকে গেল? না আসুক, সে-ই ভাল, তাহলে খারাপ কিছু ঘটা থেকে বেঁচে যাবে মুসা।

ঠিক এই সময় শোনা গেল ইঞ্জিনের শব্দ।

মুখে আঙুল পুরে তিনবার তীক্ষ্ণ শিস দিল কিশোর।

গাড়িটা গোঁ গোঁ করে বেরিয়ে গেল তার সামনে দিয়ে। আরও দুবার শিস দিল সে।

গাড়িটা বাঁকের ওপাশে অদৃশ্য হয়ে যেতেই খাঁচাটা নিয়ে লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল কিশোর। তুলসীবন ভেঙে দুপদাপ করে এসে পড়ল রাস্তায়, দৌড় দিল গাড়ির পেছনে।

শিসের শব্দ শুনে উঠে দাঁড়িয়েছে মুসাও। সবগুলো বেলুনের মুখে বাঁধা লম্বা সুতোর মাথা এক করে ধরে রেখেছে, হ্যাঁচকা টানে সব নিয়েই এসে নামল রাস্তায়।

দ্বিতীয়বার শিস যখন দেয়া হলো, একগাদা বেলুনের মাঝে শুধু বেরিয়ে আছে তার চশমা পরা মুখটা।

দেখা গেল গাড়ি। গতি কমছে। অনিশ্চিত ভঙ্গিতে থেমে গেল বেলুনের ব্যারিকেডের কয়েক গজ দূরে।

জানালা দিয়ে মুখ বাড়িয়ে চেঁচিয়ে কিছু বলল হ্যারিকিরি, জাপানী ভাষায়।

শুনতেই যেন পায়নি মুসা, ভাব দেখাল বেলুন সামলাতে হিমশিম খাচ্ছে। আসলে ব্যারিকেড আরও ছড়িয়ে দিচ্ছে সুতোয় ঝাঁকুনি দিয়ে, গাড়ি বেরোনোর পথ রুদ্ধ করে দিচ্ছে। হালকা বাতাসে রঙিন একটা দেয়াল গজিয়েছে যেন পথের ওপর।

গাড়ি থেকে নেমে এগিয়ে এল হ্যারিকিরি। মুসার দিকে চেয়ে বিস্ময় ফুটল চোখে। সব চেয়ে কাছের বেলুনটা সই করে ধাঁ করে এক লাথি চালাল। বাতাসে দোল খেল বেলুনটা, আলতো করে গিয়ে লাগল তার নিজেরই নাকে। থাবা দিয়ে চোখের সামনে থেকে ওটা সরিয়ে আবার কিছু বলল সে।

জোর করে হাসল মুসা। 'আমাদের ডানাওয়ালা বন্ধুদের রক্ষা করুন, একটা বেলুন কিনুন।'

জাপানীতে বিড়বিড় করল হ্যারিকিরি।

হাসি বজায় রাখল মুসা। 'যা খুশি বলবে,' বলে দিয়েছে কিশোর। কিন্তু যা-খুশিও মুখে আসছে না এখন মুসার। বেকায়দা অবস্থায় পড়ে রেগে গেল সে। 'চুলোয় যাক ডানাওলার বাচ্চারা। নাক ভোঁতা জাপানীর বাচ্চা জাপানী, চোরের গুষ্টি চোর, ব্যাটা মুক্তো চুরি করে এখন আমাকে ফেলেছিস বিপদে। বেলুন কিনবি তো কেন, নইলে···' গাল দিয়ে মনের ঝাল মেটাতে পেরে এতক্ষণে সত্যি সত্যি হাসি ফুটল তার মুখে। 'দুঃখিত, চোরা সাহেব, আপনাকে জায়গা দিতে পারছি না। কিশোর, নিষেধ করেছে। আপনি এখানে আটকে থাকলে আমাদের বিশেষ সুবিধে। আপনার হাতে হাতকড়া পরিয়ে শ্রীঘরে পাঠিয়ে দিতে চাই তো, তাই এই ব্যবস্থা। না, বেশিক্ষণ আটকাব না,' চোখের কোণ দিয়ে দেখল, কিশোর দৌড়ে আসছে, গাড়ির দশ গজ দূরে রয়েছে। পায়ে স্নীকার পরা থাকায় শব্দ হচ্ছে না।

সব চেয়ে শক্ত কাজটা এখন করতে হবে কিশোরকে, হ্যারিকিরির অলক্ষে খুলতে হবে ভ্যানের পেছনের দরজা। কোন রকম শব্দ করা যাবে না। ভ্যানের ইঞ্জিন চালু রয়েছে, এটাই ভরসা।

'চাইলে তোমার কারাতে এসে পরীক্ষা করতে পারো আমার ওপর,' সাহস ফিরে পেয়েছে মুসা। ভয়ঙ্কর জলদস্যুদের নাকানি-চোবানি খাইয়ে এসেছে ওরা, আর সামান্য একটা পুঁচকে জাপানীর ভয়ে মচকে যাবে, এ হতে পারে না, নিজেকে বোঝাল সে। 'তুমি দশটা দিলে আমি একটা তো দিতে পারব।' জোরে জোরে বলল কিশোরের কাছে শেখা বাংলা কবিতার একটা লাইন, 'বিনা যুদ্ধে নাহি দিব সূচ্যগ্র মেদিনী···'

পকেটে হাত ঢোকাল হ্যারিকিরি।

'কি খুঁজছে ব্যাটা?' কণ্ঠস্বর আরও চড়িয়ে বলল মুসা, 'আল্লাহরে, ব্যাটা আবার পিস্তল বের করবে না তো? নাহ্ হয়তো পয়সা···'

পৌঁছে গেছে কিশোর। সাবধানে দরজার হাতল ধরে ঘোরাল। খুলে ফেলল দরজা।

পাহাড়ের ওপর থেকে রবিন দেখতে পাচ্ছে ভালমত।

কিশোরকে নিচু হয়ে গাড়িতে ঢুকে যেতে দেখল। হাতের রুমালটা আরও শক্ত করে চেপে ধরল সে।

আছে, গাড়ির পেছনে খাঁচাটা আছে। ওটা সরিয়ে টমের খাঁচাটা ওই জায়গায় রেখে দিল কিশোর। কানে আসছে মুসার কণ্ঠ, 'যত ভেলকিই দেখাও বাবা, জায়গা ছেড়ে আমি নড়ছি না···আঁউ!' চমকে গেছে কোন কারণে, থেমে গেল কণ্ঠস্বর। কিশোর জানে না, পয়সা নয়, ছুরি বের করেছে হ্যারিকিরি। লম্বা, বাঁকা, ঝকঝকে ফলা।

দরজা বন্ধ করে দিল কিশোর। ফটাস করে শব্দ হলো, বেলুন ফুটল বোধহয়।

'এগিও না, খবরদার!' জোর নেই মুসার গলায়।

আরও কয়েকটা বেলুন ফুটল ফটাস ফটাস করে।

চেঁচিয়ে উঠল মুসা, 'কিশোর, জলদি করো! আর আটকাতে পারছি না। ছুরি চালাচ্ছে ব্যাটা, বেলুনগুলোর দফারফা, আমারও হবে···'

দরজা খুলে লাফিয়ে নামল কিশোর, নিঃশব্দে। খাঁচাটা দুহাতে ধরে রেখেছে বুকের ওপর। একবারও ফিরে না তাকিয়ে সোজা দৌড় দিল যেদিক থেকে এসেছিল সেদিকে।

'ভাগো, কিশোর, জলদি করো!' বেলুনগুলো হাত থেকে ছেড়ে দিয়েছে মুসা, এদিক ওদিক উড়ছে আর রাস্তায় গড়াগড়ি খাচ্ছে ওগুলো। তার ভেতরে একবার এদিকে লাফ দিয়ে পড়ছে সে, একবার ওদিক, হ্যারিকিরির ছুরির পোঁচ থেকে বাঁচার জন্যে। বার বার তাকাচ্ছে ছোট পাহাড়টার দিকে। ইস্, এত দেরি হচ্ছে কেন?

ছুটে পালাবে কিনা ভাবছে মুসা, এই সময় দেখতে পেল রবিনকে। পাগলের মত রুমাল নাড়ছে সামনে-পিছনে।

এগিয়ে আসছে হ্যারিকিরি।

দু-হাত সামনে তুলে তাকে বলল মুসা, 'যাচ্ছি, বাবা, যাচ্ছি, সরে যাচ্ছি। আমাদের কাজ শেষ। জাহান্নামে যেতে পারো এবার তুমি।' বলেই ঘুরে দিল দৌড়, সরে চলে গেল রাস্তা থেকে।

গাড়িতে ফিরে গেল হ্যারিকিরি। চলে গেল শাঁ করে। চাকার নিচে পড়ে ফাটল আরও কয়েকটা বেলুন।

ধপ করে বসে পড়ল মুসা তুলসীবনের ধারে। হাঁপাচ্ছে।

খাঁচা হাতে ঝোপ থেকে বেরিয়ে এল কিশোর। কাছে এসে মুসার কাঁধে হাত রেখে শুধু বলল, 'থ্যাংক ইউ।'

রবিনও এসে দাঁড়াল। 'মুসা, তোমার হয়নি তো কিছু? পোঁচটোঁচ লাগেনি?'

ধীরে ধীরে এপাশ ওপাশ মাথা নাড়ল মুসা। 'না, বেলুনগুলোর ওপর দিয়ে গেছে। তবে আমার বুকের ধড়ফড়ানি বোধহয় আর কোনদিন যাবে না। পারমানেন্ট রোগ বাধালাম।'

# তেরো

'যাই হোক,' জিরিয়ে নিয়ে বলল কিশোর, 'কাজ হয়েছে। গাড়িতে করে টমকে নিয়ে গেছে হ্যারিকিরি।'

'তা গেছে,' কপালের ঘাম মুছতে মুছতে বলল মুসা। 'কিন্তু এরপর কি?'

খাঁচার চীজক্লথ খুলছে কিশোর। 'আমাকে একটু সাহায্য করবে, রবিন?'

চীজক্লথ ছিঁড়ে খাঁচার দরজা খুলে পায়রাটাকে বের করল দুজনে।

'ধরো, শক্ত করে ধরে রাখো,' বলল কিশোর।

রবিন ধরে রাখল।

পকেট থেকে একটা অ্যালুমিনিয়মের পাতলা পাতের আঙটা বের করে লাগিয়ে দিল কিশোর কবুতরের পায়ে, তাতে কায়দা করে লাগিয়ে দিল তিন গোয়েন্দার একটা কার্ড। কার্ডটা ভাঁজ করে শক্ত করে গুঁজে দিয়েছে আঙটার ভেতরে, কেউ না খুললে আপনা-আপনি খুলে পড়বে না। আরও নিশ্চিত হওয়ার জন্যে পায়ের সঙ্গে শক্ত করে টেপ দিয়ে পেঁচিয়ে দিল।

'মুসা,' বলল কিশোর, 'পায়রাটাকে ছাড়ার সম্মান তোমারই প্রাপ্য।'

খুশি হলো মুসা। কবুতরটাকে নিয়ে উঠে দাঁড়াল। এক হাতে ধরে রেখে আরেক হাত ওটার পিঠে বুলিয়ে আদর করল। বলল, 'বাড়ি যাও, খোকা,' বলে উড়িয়ে দিল।

কয়েক সেকেণ্ড মাথার ওপর ফড়ফড় করল পাখিটা, তারপর কোণাকুণি উড়ে শাঁ করে উঠে গেল রকেটের মত, তীব্র গতিতে উড়ে গেল উপকূলের দিকে।

দুই ঘণ্টা পর ইয়ার্ডে ফিরে এল তিন গোয়েন্দা।

'এসেছ,' ওদের দেখেই এগিয়ে এলেন মেরিচাচী। 'আমি তো ভাবলাম, দিনটাও কাটিয়ে আসবে···কিশোর, একগাদা মাল নিয়ে এসেছে তোর চাচা। বোরিস আর রোভার মাল আনতে গেছে আরেকখানে, তোরা একটু হাত লাগাবি?'

মাথা কাত করল কিশোর। কাজ করতে অসুবিধে নেই। দুপুরের দেরি আছে এখনও আরও দু-ঘণ্টা। তাছাড়া অপেক্ষার মুহূর্তগুলো হয় বড় দীর্ঘ। কাজ করলে বরং দ্রুতই কাটবে সময়।

হাত চালাচ্ছে বটে, কিন্তু কাজে মন নেই ওদের। বার বার তাকাচ্ছে আকাশের দিকে। কান খাড়া করে রেখেছে ডানার ঝটপট শব্দের জন্যে।

সাড়ে এগারোটার দিকে চাচাকে ড্রাইভার বানিয়ে নিয়ে চাচী গেলেন বাজার করতে। দুটোর আগে ফিরবেন বলে মনে হয় না। স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল কিশোর। চাচীর সামনে কবুতরটা নামলে প্রশ্নের জবাব দিতে দিতে জান খারাপ হয়ে যেত ওর। সেদিক থেকে আপাতত নিশ্চিন্ত।

দুপুরের আগে কাজ থামিয়ে দিল ওরা। ওয়ার্কশপের বাইরে বসে অপেক্ষা করতে লাগল। আকাশের দিক থেকে চোখ নামাচ্ছে না তিনজনের একজনও।

বার বার ঘড়ি দেখছে কিশোর।

হঠাৎ লাফিয়ে উঠে দাঁড়াল মুসা। কিন্তু বোকা বনে গেল পরমুহূর্তেই। একটা সোয়ালো উড়ে চলে গেল সাঁ করে।

'ঠিক কখন যে ছাড়বে হ্যারিকিরি, জানি না,' বলল কিশোর। 'হয়তো আগে খাওয়া-দাওয়া, তারপর…'

আবার লাফিয়ে উঠল মুসা।

না, এবার আর ভুল করেনি।

কিশোর আর রবিনও দেখল, চকচকে পালক। মাথার ওপর একবার চক্কর দিয়ে নেমে আসতে শুরু করল।

'টম!' হাত নেড়ে চেঁচিয়ে ডাকল মুসা। 'টম! এই যে, এখানে টম!'

টমও দেখেছে। গোত্তা দিয়ে নেমে পড়ল একেবারে মুসার বাড়ানো হাতের তালুতে। বার দুই ডানা ঝাপটে চুপ হয়ে বসল।

প্রায় ছোঁ মেরে পাখিটাকে ছিনিয়ে নিল কিশোর। প্রথমেই পা দেখল। পাতলা ধাতুর একটা আঙটা পরানো। কাঁপা হাতে আঙটাটা খুলে ফেলতেই টুপ করে মাটিতে পড়ল উজ্জ্বল একটা কিছু।

উবু হয়ে তুলে নিল কিশোর।

অন্য দুজনও ঝুঁকে এল দেখার জন্যে।

কিশোরের খোলা হাতের তালুতে ঝকমক করছে মস্ত একটা মুক্তো।

'যাক, আমাদের অনুমান তাহলে ঠিকই হয়েছে,' বলল কিশোর। 'হ্যারিকিরি, রিচার্ড হ্যারিস, দু-আঙুলা কবুতর…'

'আমাকে দাও ওটা,' কর্কশ কণ্ঠে বলে উঠল কেউ।

ঝট করে ফিরে তাকাল তিন গোয়েন্দা।

ওয়ার্কশপের ভেতর থেকে কথা বলেছে লোকটা। জঞ্জালের বেড়া ঘুরে দরজায় বেরিয়ে এল। পরনে কালো অয়েলস্কিন, চোখে কালো চমশা। দাড়ি-গোঁফের জঙ্গলের মাঝে একটুখানি পরিষ্কার জায়গা—নাকের ফুটো দুটো।

ডান হাত বাড়িয়ে ধীরে ধীরে এগোল লোকটা। শক্ত করে ধরে রেখেছে লম্বা ব্যারেলের একটা পিস্তল।

মুসার মনে হলো নলের কালো ছিদ্রটা তার বুকের দিকেই নিশানা করে আছে। বুক ধড়ফড়ানি শুরু হলো আবার তার। মনে মনে বলল, 'বলেছিলাম না, রোগটা পারমানেন্ট হয়ে গেছে।' আস্তে করে পাশে সরে যাচ্ছে সে, বেড়ার কাছে।

কিশোরের দিকে এগিয়ে আসছে লোকটা। 'দাও, মুক্তোটা আমাকে দাও।'

লোকটার পিস্তল বা মুখের দিকে নজর নেই কিশোরের, সে তাকিয়ে আছে পায়ের দিকে, জুতোর দিকে। লোকটা কিছু বুঝে ওঠার আগেই চোখের পলকে মুক্তোটা মুখে পুরে জিভের ডগা দিয়ে ঠেলে একদিকের গালের কোণায় নিয়ে এল সে। শান্তকণ্ঠে বলল, 'আর এক পা যদি এগোন, মুক্তোটা আমি গিলে ফেলব।'

রাগে কেঁপে উঠল লোকটা। ঝাঁপিয়ে পড়ল কিশোরের ওপর। গলা চেপে ধরতে চায়, যাতে গিলতে না পারে কিশোর।

লাফ দিয়ে এগিয়ে এল রবিন। লোকটার কাঁধ চেপে ধরে হ্যাঁচকা টানে সরিয়ে

নেয়ার চেষ্টা করল।

সরতে গিয়ে একটা ঝাড়ুর ডাণ্ডায় হোঁচট খেল মুসা।

কিশোরের গলা চেপে ধরে আরেক হাতে পিস্তল দিয়ে বাড়ি মেরে রবিনকে ঠেকানোর চেষ্টা করছে লোকটা। বুকে বাড়ি খেয়ে ব্যথায় উফ করে উঠল রবিন। কিন্তু লোকটার কাঁধ ছাড়ল না, অয়েলস্কিন খামচে ধরে প্রায় ঝুলে রইল।

ঝাড়া দিয়ে লোকটার হাত ছাড়াতে চাইছে কিশোর। মুক্তোটা গালের কোণে আটকে রেখেছে শক্ত করে।

'সরো, রবিন, সরো!' চেঁচিয়ে উঠল মুসা।

সাহস ফিরে পেয়েছে আবার গোয়েন্দা-সহকারী। তার এই আরেক গুণ, এমনিতে ভয় পেলেও সত্যিকার বিপদের সময় বাঘের বাচ্চা হয়ে ওঠে সে, রীতিমত দুঃসাহসী বলা যায় তখন।

সরে গেল রবিন।

ঝাঁটার ডাণ্ডা দিয়ে ধাঁ করে লোকটার ঘাড়ে বাড়ি লাগিয়ে দিল মুসা।

কিশোরের গলা ছেড়ে দিল লোকটা, টলে পড়ে যাচ্ছে। হাত থেকে পিস্তল ছুটে গেল, নাকের ওপর থেকে খসে পড়ল চশমা।

কোনমতে সামলে নিল সে আবার, কিন্তু দাঁড়ানোর শক্তি নেই। বসে পড়ল। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বলল, 'পারলাম না আমি। তোমাদেরই জিত হলো।' চোখ টিপল অদ্ভুত ভঙ্গিতে।

পিস্তলটা কুড়িয়ে নিল কিশোর। 'গুলি আছে?'

'না না, বাতিল, নষ্ট পিস্তল। বন্দুক-টন্দুককে সাংঘাতিক ভয় পাই আমি,' চোখ পিটল লোকটা পর পর দুবার। ইচ্ছে করে করছে না এমন, এটা তার মুদ্রাদোষ। দুর্বল ভঙ্গিতে উঠে দাঁড়াল।

বাড়ি মারার জন্যে ডাণ্ডা তুলল মুসা।

'মেরো না, মেরো না,' তাড়াতাড়ি দু-হাত নাড়ল লোকটা। 'আর ভাল লাগছে না আমার এসব। কেন যে মরতে এই অকাজ করতে গিয়েছিলাম। সব সর্বনাশের মূল ওই ঘোড়া, বুঝেছ, ঘোড়া। রেস খেলে ফতুর হয়ে গেছি, ধারকর্জ করে করে...লোকজন তাগাদা দিচ্ছে টাকার জন্যে। তাই কিছু টাকা জোগাড় করতে চেয়েছিলাম।'

লোকটার জন্যে এখন দুঃখই হচ্ছে কিশোরের। 'হয়ে যেত জোগাড়, মিস কারমাইকেলের বাজপাখিগুলোর জন্যে পারলেন না।'

মুখ থেকে মুক্তোটা বের করে পকেটে রেখে দিল কিশোর।

চুপচাপ দেখল লোকটা, অসহায় ভাবভঙ্গি।

'ওগুলো আর খামোকা লাগিয়ে রেখেছেন কেন?' বলল কিশোর। 'ওই দাড়িগোঁফ। খুলে ফেলুন। অস্বস্তি লাগছে না?'

'হ্যাঁ, খুলেই ফেলি,' চোখ টিপল ব্লিংকি।

দাড়িগোঁফ আর কালো অয়েলস্কিন খুলে ফেলার পর উলঙ্গ মনে হলো অসকার স্লেটারকে। দেহের আকারও যেন এক ধাক্কায় কমে গেছে অনেক।

নার্ভাস ভঙ্গিতে ক্রমাগত চোখ টিপে যাচ্ছে লোকটা। রবিন আর মুসাকে পাহারায় রেখে থানায় ফোন করতে চলল কিশোর।

## চোদ্দ

'সব স্বীকার করেছে অসকার স্লেটার,' বলল কিশোর। 'তিনজনকেই অ্যারেস্ট করে হাজতে ভরেছিল পুলিশ। ব্লিংকি, রিচার্ড হ্যারিস, হ্যারিকিরি। হ্যারিস আর হ্যারিকিরি জামিনে মুক্তি পেয়েছে। কিন্তু ব্লিংকি ইচ্ছে করেই রয়ে গেছে হাজতে, জামিনে মুক্তি নেয়ার চেষ্টা করছে না। ওর সঙ্গে দেখা করতে গিয়েছিলাম, গোপনে বলেছে আমাকে একথা। হাজতে থাকলেই নাকি এখন তার ভাল, নিজেকে শোধরাতে বাধ্য হবে। রেস খেলা বন্ধ হবে। তবে আমার ধারণা, আসল কারণটা অন্য, হ্যারিস আর হ্যারিকিরির ভয়েই আসলে বেরোতে সাহস পাচ্ছে না।'

বিখ্যাত চিত্রপরিচালক মিস্টার ডেভিস ক্রিস্টোফারের অফিসে বসে আছে তিন গোয়েন্দা। তাদের এবারকার কেসের রিপোর্ট দিচ্ছে পরিচালককে।

'ওদের মুক্তো চুরির খবর জানল কি করে ব্লিংকি?' জিজ্ঞেস করলেন পরিচালক।

'রিচার্ড হ্যারিসের চাকরি করত সে,' জবাব দিল রবিন। 'কবুতর দেখাশোনা করত, গহনার দোকানেও সাহায্য করত মাঝেসাঝে। তারপর একদিন ক্যাশ চুরি করে ধরা পড়ল। বের করে দিল তাকে হ্যারিস। কিন্তু ততদিনে হ্যারিসের গোপন ব্যবসার অনেকখানিই জেনে ফেলেছে ব্লিংকি, জেনে গেছে বেআইনী পথে মুক্তো আসে।'

'কিন্তু কোন পথে আসে, জানত না,' রবিনের কথার রেশ ধরে বলল মুসা। 'চাকরি যাওয়ার পর পেছনে লাগল সে। বের করে ছাড়ল, কোন পথে মুক্তো আসে।'

'আকাশ পথে,' চেয়ারে হেলান দিলেন পরিচালক। 'তাতেই মতলবটা মাথায় ঢুকল ব্লিংকির, ওরা যদি কবুতর দিয়ে আনাতে পারে, সে কেন পারবে না। এর জন্যে তার নিজস্ব কয়েকটা রেসিং হোমার দরকার শুধু। তাই না, কিশোর?'

মাথা ঝাঁকাল কিশোর। 'দুটো সুবিধে ছিল ব্লিংকির। এক, রিচার্ড হ্যারিস একজন অভিজ্ঞ ব্যবসায়ী, বেশি তাড়াহুড়ো করতে গেলে যে বিপদ হয়, এটা তার জানা, ফলে ধীরে সুস্থে এগোচ্ছিল সে। হপ্তার নির্দিষ্ট কয়েকটা দিনে কেবল কবুতর রেখে আসত হ্যারিকিরির ভ্যানে, কখনও সকালে, কখনও আগের দিন বিকেলে। হ্যারিকিরির সঙ্গে দেখা করত না সে, খুব হুঁশিয়ার লোক, টাকা দিত মাসে একবার। তা-ও হাতে হাতে নয়, খামে টাকা ভরে খাঁচার সঙ্গে টেপ দিয়ে আটকে চীজক্লথ মুড়ে রেখে আসত ভ্যানে, কবুতরের সঙ্গে...'

'তবে জরুরী দরকার পড়লে দেখা করতেই হত,' যোগ করল কিশোর। 'তেমন একটা জরুরী অবস্থায় ফেলে দিয়েছিলাম আমরা, টমকে নিয়ে তার কাছে গিয়ে। ভয় পেয়ে যায় হ্যারিস, ব্যাপারটা নিয়ে আলোচনা করার জন্যে ছোটে হ্যারিকিরির বাড়িতে। আমাদের সঙ্গে সেদিনই দেখা হয়েছিল তার।'

'তোমাদেরকে লাঞ্চ খাইয়েছে যেদিন,' মাথা নোয়ালেন পরিচালক। 'কিশোর, দ্বিতীয় সুবিধেটা কি?'

'হ্যারিকিরি জাপানী,' বলল কিশোর। 'মাঝারি উচ্চতা, মুখ ভর্তি দাড়িগোঁফওয়ালা যে কোন আমেরিকানের চেহারা তার কাছে একরকম। দূর থেকে পোর্টিকোর ম্লান আলোয় আলাদা করে চিনতেই পারে না। অয়েলস্কিন পরে, নকল দাড়িগোঁফ লাগিয়ে যখন যেত ব্লিংকি, ভ্যানে কবুতর রাখতে, বুঝতেই পারত না হ্যারিকিরি যে লোকটা হ্যারিস নয়। আড়ালে থেকে লক্ষ রাখত ব্লিংকি, হ্যারিস আসে কিনা, যদি না আসত, খাঁচায় ভরা নিজের কবুতর নিয়ে গিয়ে রেখে আসত ভ্যানে।'

'হুঁ, বুদ্ধিটা ভালই,' বললেন পরিচালক।

'হ্যাঁ, ভালই চলছিল বেশ কিছুদিন। হ্যারিকিরি টের পাচ্ছিল না, ফলে ব্লিংকিও মুক্তো পাচ্ছিল। বাধ সাধল মিস কারমাইকেলের শিকারী বাজ।'

'ব্লিংকিকে নিশ্চয় চেনেন মিস কারমাইকেল, না?' জিজ্ঞেস করলেন পরিচালক। 'অনেক দিন হ্যারিসের ওখানে চাকরি করেছে লোকটা, মহিলাও দামী কাস্টোমার, পরিচয় হয়ে যাওয়ার কথা। তারমানে মহিলার বাড়িও চেনে। কবুতর যখন ফিরল না একদিন, নিশ্চয় খোঁজখবর নিতে শুরু করল। সন্দেহ করল, মিস কারমাইকেলের বাজপাখিই এজন্যে দায়ী। ব্যস, গিয়ে শুরু করল বাজগুলোকে বিষ খাওয়ানো, ঠিক বলিনি?'

'হ্যাঁ। আরেকটা গোলমাল হলো, হঠাৎ করে বাড়ি বদল করল হ্যারিকিরি। ওদিকে পাওনাদারেরা চাপ দিতে শুরু করেছে। টাকার জন্যে মরিয়া হয়ে উঠল ব্লিংকি। হ্যারিকিরিকে অনুসরণ করে তার বাড়ির খোঁজ বের করা ছাড়া আর কোন উপায় দেখল না সে। সেদিন সেজন্যেই বসেছিল সে স্ন্যাকস রেস্টুরেন্টে। তাড়াহুড়োয় ভুলে দু-আঙুলার খাঁচাটা ফেলে যায়।'

'হুঁ, এই প্রশ্নটারই জবাব পাচ্ছিলাম না,' ওপরে নিচে মাথা দোলালেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'তারপর কি করল? দু-আঙুলাটাকে বদলে আনল কেন আবার?'

'হ্যারিকিরির পিছু নিয়ে তার নূতন বাড়িতে চলে গেল ব্লিংকি,' বলে গেল কিশোর। 'লুকিয়ে রইল দূরে, চোখ রাখল বাড়ির ওপর। সেদিন বিকেলেই এল হ্যারিস, কবুতর নিয়ে। আগের দিন বাড়ি বদলেছে হ্যারিকিরি, ঝামেলা ছিল, ফলে ছুটি নিতে হয়েছে, তাই পরের দিন ছুটির মধ্যে কাজ করে দেয়ার কথা। দুদিন মুক্তো পায়নি, তাই হ্যারিসও সেদিন কবুতর নিয়ে এসেছে। ভ্যানের পেছনে খাঁচা রেখে সে চলে গেল। ব্লিংকির তখন টাকার খুব দরকার। সে গিয়ে খাঁচাটা বের করে নিয়ে এল, তার নিজের কবুতর রাখবে তার জায়গায়। কিন্তু রেস্টুরেন্টে ফোন করে করে জানল, তার খাঁচা নিয়ে গেছি আমরা। ফলে আমাদের খুঁজে বের করতে হলো তাকে। হ্যারিসের কবুতরটা ছাড়তে সাহস হয়নি তার, ওটা ফিরে যাবে বাড়িতে, তাহলে গণ্ডগোল লাগবে। তাই তারটা খাঁচা থেকে বের করে নিয়ে হ্যারিসেরটা ভরে রেখে গেল।'

'কিন্তু পরদিন দুপুরে তার কবুতর মুক্তো নিয়ে ফেরেনি,' বললেন পরিচালক।

'না,' মাথা নাড়ল কিশোর। 'এর আগেও দুটো কবুতর আর মুক্তো খুইয়েছে

ব্লিংকি। তিন নম্বরটা হারিয়ে ভীষণ রেগে গেল সে। মিস কারমাইকেলের বাড়ি গিয়ে বাজপাখিকে বিষ খাওয়াতে শুরু করল। আমাদেরকে ঢুকতে দেখেছে সে। দোয়েলটা যে তার মুক্তো চুরি করেছে, এটাও নিশ্চয় দেখেছে।'

'তাই মাথা আর ঠিক রাখতে পারেনি,' মুচকি হাসলেন পরিচালক। 'রাগের মাথায় পিটিয়ে মেরেছে দোয়েলটাকে।'

'আমাদেরকে বেরোতেও দেখেছে সে,' আবার বলল কিশোর, 'টমকে দেখেছে আমাদের সঙ্গে। পিছু নিয়েছে। আমাদেরকে হ্যারিসের দোকানে ঢুকতে দেখে সাংঘাতিক ভয় পেয়েছে।'

'ফুটপাথে বেরিয়ে দেখেছি আমরা কালো গাড়িটাকে,' প্রমাণ দিল রবিন।

'নিশ্চয় দ্বিধায় পড়ে গিয়েছিল ব্লিংকি,' বললেন মিস্টার ক্রিস্টোফার। 'হ্যারিসের সঙ্গে তোমাদের কি কথাবার্তা হয়েছে, জানার কথা নয় তার।'

'হ্যাঁ,' হেলান দিল কিশোর। 'খুব বেশি চালাকি করেছে হ্যারিস আমাদের সঙ্গে। টমকে যেন চিনতেই পারেনি, এমন ভাব দেখিয়েছে। মেয়ে রেসিং হোমার রেস দেয় না, একথা বলে বোকা বানানোর চেষ্টা করেছে আমাদেরকে।'

'সে তো আর কল্পনা করেনি, কার পাল্লায় পড়েছে,' হাসল মুসা।

'তিন গোয়েন্দাকে তুচ্ছ জ্ঞান করে ভুলই করেছে সে,' স্বীকার করলেন পরিচালক। 'তারপর?'

'ব্লিংকি গেল ভয় পেয়ে,' আগের কথার খেই ধরল কিশোর। 'সে চাইল, আমাদের সন্দেহ হ্যারিসের ওপর পড়ুক, একই সঙ্গে টমকে ছেড়ে বাড়ি পাঠিয়ে দিয়ে হ্যারিসকেও ঠাণ্ডা রাখতে চাইল, তাই ফোন করল আমাদেরকে। টমকে নিয়ে যেতে বলল। গেলাম। পাখিটা ছিনিয়ে নিল আমার কাছ থেকে।'

থামল কিশোর। 'আমাকে বোকা প্রায় বানিয়েই ফেলেছিল। আবছা অন্ধকারে এক পলকের জন্যে চেহারা দেখেছি তার। তাছাড়া মিস কারমাইকেলের বাগানে যে চেহারা দেখেছি, ওটা সেই একই চেহারা।'

'সন্দেহ শুরু করলে কখন?'

'বাগানেই সন্দেহ করেছি। সাইকেলের আলো মুখে পড়ায় যখন ঘাবড়ে পালাল। এক বাড়ি মেরে মিস করেছে, আরও তো মারতে পারত। তা না করে দৌড়, ভয় যে পেয়েছে সেটা প্রকাশ করে দিল। তারপর পেলাম পায়ের ছাপ। তবে স্পষ্ট করে দিয়েছে মুসা...'

'আমি?' সহকারী গোয়েন্দা অবাক।

'হ্যাঁ, তুমি, মানে তোমার বাবার কালো চশমা। সেদিন তুলসীবনে ওটা পরেই ঘুমিয়েছিলে, তোমার চোখ দেখতে পাইনি। শিওর হয়ে গেলাম, কেন চশমা না পরে সামনে আসে না ব্লিংকি। কারণ, তার চোখ মিটমিট করার মুদ্রাদোষ আছে। চশমা ছাড়া লুকায় কি করে?'

'হুঁ,' চেয়ারের হাতলে আস্তে আস্তে চাপড় দিলেন পরিচালক। 'তা, মিস কারমাইকেল কেমন আছেন? তাঁর পাখি খুনের রহস্য তো ভেদ হলো।'

'ভাল,' হেসে বলল মুসা। 'তাঁর বাজ পাখিকে বিষ খাওয়াবে না আর কেউ।

তবে হীরার কথা তুললেই মন খারাপ হয়ে যায়।'

'দোয়েল তো আরেকটা আছে···কি যেন নাম···'

'পান্না। কিন্তু ওটা তো হীরার মত মুক্তো আনে না। আনে যত্তোসব চুলদাড়ি, ভাঙা কাচ···'

'তবে দাড়ি পেয়ে কিশোরের সুবিধে হয়েছে,' বললেন পরিচালক। 'তাই না, কিশোর?'

'হ্যাঁ, স্যার। ব্লিংকির দাড়িগোঁফ যে নকল, বুঝতে পেরেছি।'

দরজায় নক করে ভেতরে ঢুকল মিস্টার ক্রিস্টোফারের বেয়ারা। এক হাতে কয়েকটা খাবারের বাক্স, আরেক হাতের তালুতে বসে আছে একটা তোতা।

মুসার উজ্জ্বল চোখের দিকে চেয়ে ব্যাখ্যা করলেন পরিচালক, 'জানি তো, অনেক কথা থাকবে তোমাদের। তাই আসছ ফোন পেয়েই অর্ডার দিয়ে রেখেছি···' বেয়ারার দিকে ফিরলেন। 'কার তোতা ওটা? কোত্থেকে আনলে?'

'মুসা আমানের সাইকেলে বসা দেখলাম,' জবাব দিল বেয়ারা। 'খালি চেঁচাচ্ছিল। কিচ্ছুই বুঝতে পারছিলাম না। ভাবলাম, ওনাদেরই কারও,' তিন গোয়েন্দাকে দেখাল সে। 'আসবে নাকি জিজ্ঞেস করতেই উড়ে এসে বসল হাতে। রেখে আসতে পারলাম না।'

'এটাই মিস কারমাইকেলের সেই তোতা নাকি?' মুসাকে জিজ্ঞেস করলেন পরিচালক।

'হ্যাঁ, স্যার,' বলল মুসা। 'তাঁর বাড়ি গিয়েছিলাম, তোতাটা কিছুতেই ছাড়ল না, তাই সঙ্গে নিয়ে এসেছি। মিস কারমাইকেলকে বলেছি, সন্ধ্যায় ফিরিয়ে দিয়ে আসব।'

'জিম বলছে, কিছু নাকি বলছিল।'

'কি রে, কি বলছিলি?' তোতাটাকে হাতে নিয়ে জিজ্ঞেস করল মুসা।

যেন মুসার প্রশ্নের জবাবেই গেয়ে উঠল তোতা, 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালবাসি।'

ভুরু কুঁচকে মুসার দিকে তাকালেন পরিচালক। চোখ নাচালেন, অর্থাৎ মানে কি?

'বাংলাদেশের জাতীয় সঙ্গীত, স্যার,' বলল মুসা। 'সেদিন সন্ধ্যায় গেয়েছিলাম আমরা, শিখে নিয়েছে।'

'কি মিস্টার,' খাবারের বাক্স খুলতে খুলতে তোতাটার দিকে ফিরে চাইল বেয়ারা, 'বাড়ি আমেরিকায়, থাকো আমেরিকায়, খাও এখানকার, গান বাংলাদেশের কেন? খুব খারাপ কথা।'

'নিষ্ঠুর!' চেঁচিয়ে উঠল তোতা। 'নিষ্ঠুর! নিষ্ঠুর!'

হেসে উঠল তিন গোয়েন্দা। সদাগম্ভীর চিত্রপরিচালক পর্যন্ত সব কিছু ভুলে হেসে উঠলেন হো হো করে।

***